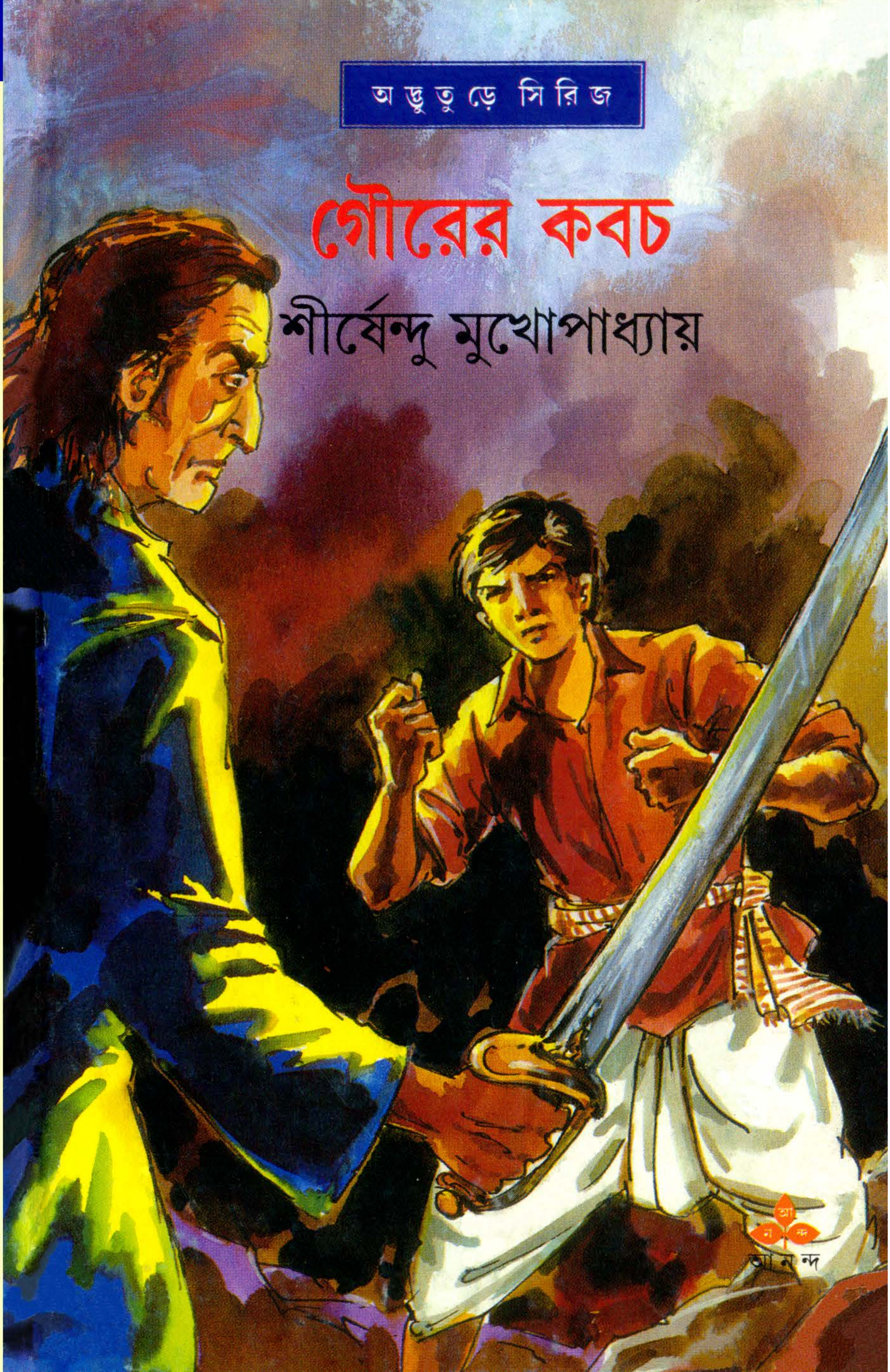

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

গৌরের কবচ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আনন্দ

গৌরের কবচ • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আনন্দ

গৌরের কবচ

গৌরের কবচ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

আ ন ন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮৬
দ্বিতীয় সংস্করণ মে ২০০৬

© শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7756-590-7

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

৭৫.০০

"রা-স্বা"

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

মান্টি, রন্টি ও মাধবকে

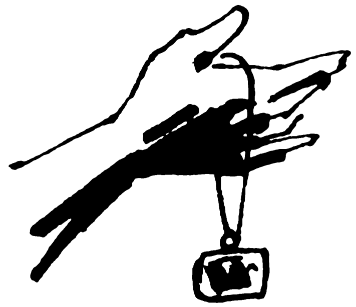

গৌরগোপালেরা বড়ই গরিব। গ্রামের মধ্যে তাদের বাড়িখানাই সবচেয়ে বেশি ভাঙাচোরা এবং শ্রীহীন। একবুক আগাছার মধ্যে ত্যাড়াবাঁকা হয়ে কোনওক্রমে বহুকালের পুরনো বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে।

একসময়ে গৌরগোপালদের অবস্থা ভালই ছিল। জমিজমা ছিল, চাষবাস ছিল, একটু ব্যাবসাও ছিল। গৌরের ঠাকুরদার আমল থেকে অবস্থা পড়তে পড়তে এখন একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। একবেলা নুনভাত জোটে তো আর একবেলা উপোস থাকতে হয়। চাষের জমি সব দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেছে।

গৌরগোপালেরা দুই ভাই। নিতাইগোপাল বড়, গৌরগোপাল ছোট। গৌরের বয়স এখন উনিশ-কুড়ি। লেখাপড়ায় দুই ভাইয়ের কেউই ভাল নয়। তবে নিতাইগোপাল একটু সংস্কৃত জানে। পুজোআচ্চা করতে পারে। তাই করেই সে কোনওক্রমে সংসার চালায়। তাদের বাবা নেই, মা আছে। নিতাইগোপালের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা একটু পয়সাওয়ালা, তাই তার বউয়ের ভারী দেমাক। সে শ্বশুরবাড়ির লোকদের মানুষ বলে জ্ঞানই করে না। নিতাইগোপাল বউকে ভয় খায়। তাই বেশি উচ্চবাচ্য করে না। বড়ভাইয়ের সংসারে আহাম্মক গৌরগোপাল আর তার বুড়ো মা বড় অনাদরে থাকে।

গৌরগোপালের লেখাপড়া হয়নি, তেমন কোনও বিশেষ গুণও তার নেই। তবে সে খুব সরল এবং ভালমানুষ গোছের। মিথ্যে কথা

বলে না, কাউকে আঘাত দেয় না, কখনও তার মুখে কেউ কোনও খারাপ কথা বা গালাগাল শোনেনি। অতি কষ্টে অধ্যবসায়ে সে ইস্কুলের শেষ পরীক্ষাটা পাস করেছে। এখন তার দজ্জাল বউদি তাকে দিয়ে বাসন মাজায়, কাপড় কাচায়, উঠোন ঝাঁট দেওয়ায়, আগাছা পরিষ্কার করায়, গোয়ালেরও হরেক কাজ তাকে করতে হয়। এমনকী দুপুরবেলা গোরু চরানোও আজকাল তার কাজ হয়েছে।

গৌরের এই কষ্ট তার মা আর চোখে দেখতে পারে না।

একদিন মা তাকে ডেকে বলল, "শোন বাবা, আমি চোখ বুজলে এদের সংসারে তোর বড় অনাদর হবে। একটু রয়ে-বুঝে থাকিস। আর মরার আগে আমি তোকে একটা জিনিস দিয়ে যাব। সেটা সাবধানে রাখিস।"

গৌর অবাক হয়ে বলে, "কী জিনিস, মা?"

"সে আছে। সময়মতো দেখতে পাবি।"

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই গৌরের মা মারা গেল। মরার আগে গৌরকে কাছে ডেকে চুপিচুপি যে জিনিসটা তার হাতে দিল, সেটা এমন কিছু আহামরি জিনিস নয়। একটা কবচ।

গৌর খুব কান্নাকাটি করল মায়ের জন্য।

শ্রাদ্ধের পর নিতাই আর তার বউ গৌরকে একদিন ডেকে বলল, "এভাবে আর কতদিন বসে বসে খাবে? রোজগারের ধান্দায় বেরিয়ে পড়ো।"

শুনে গৌরের ভারী ভয় হল। কারণ জীবনে সে কখনও গাঁয়ের বাইরে বেরোয়নি। বাইরের জগৎটা কেমন তাও সে জানে না। তবে মুখে কিছু বলল না সে। শুধু বলল, "আচ্ছা।"

নিজের ভাঙা ঘরখানায় বসে একদিন দুপুরে ভাগ্যের পাকচক্রের কথা ভাবতে ভাবতে মায়ের দেওয়া কবচটার কথা মনে পড়ল তার।

কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীর পটের পিছনে লুকিয়ে রাখা কবচটা বের করে ভালভাবে দেখল সে। সাধারণ তামায় তৈরি। সোনা হলেও না হয় বেচে দু'পয়সা আয় হত। কবচটার গুণই বা কী? যদি গুণই থাকত, তা হলে সংসারে এত অভাব আর অশান্তিই বা কেন!

গৌরগোপাল কবচটা হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। মরার সময় তার মা বিকারের ঘোরে ভুল বকছিল। গৌরগোপাল তখন সংসারে তার শেষ স্নেহের আশ্রয় মায়ের মৃত্যু-নীল মুখখানার দিকে চেয়ে হাঁ করে বসে থাকত। কথাগুলো তার কানে সেঁধোলেও মগজে ভাল করে ঢুকত না। তার মনে পড়ল, মা বিকারের ঘোরে বলেছিল, "কবচটা কিন্তু খুব সাবধান...কখনও হারাসনি বাবা...ওর মধ্যে কিন্তু দানো আছে...দানো...খুব সাবধান..."

এই দানো কে বা কী তা গৌরগোপাল জানে না। তবে কবচটা সে আবার সাবধানে কুলুঙ্গিতে পটের আড়ালে রেখে দিল।

সংসারে তার যতই অনাদর হোক, মা যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন দু'বেলা ভরপেট খাওয়া জুটত। কিন্তু মা মরে ইস্তক সেটাই আর জুটছে না। বউদি খেতে দেয় বটে, তবে একবারের বেশি দুবার ভাত সাধে না। ভাল পদ যদি কোনওদিন কিছু রান্না হয়, তবে তা গৌরগোপালের চোখের আড়ালে রাখে। এ-সবই গৌর টের পায়, কিন্তু ভয়ে কিছু বলে না। বলে হবেই বা কী? বরং বেশি ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করতে গেলে দাদা ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। এই বাড়ি থেকে বেরোতেই গৌরের যত ভয়। বাইরের দুনিয়াটাকে তো সে একেবারেই চেনে না। এমন বিদ্যেও নেই যে, নিজে কিছু রোজগার করে খাবে।

গৌর তাই আধপেটে খেয়েও আজকাল দাদার সংসারে দ্বিগুণ খাটুনি দেয়। গোরু চরানো, বাগান পরিষ্কার, মাটি কোপানো, জল তোলা তো ছিলই, সেইসঙ্গে আরও অনেক কাজ করে দেয় সে। কাঠ

কাটে, পুকুরের পানা তোলে, দাদার ছেলে-মেয়েকে পড়ায়। সারাদিন এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেয় না। হাসি-হাসি মুখ করে সারাক্ষণ দাদা-বউদিকে খুশি করতে চেষ্টা করে, যাতে বাড়ি থেকে এরা তাকে তাড়িয়ে না দেয়।

কিন্তু বিপদ হল, হঠাৎ একদিন বউদি তার দুই ষণ্ডামতো বজ্জাত ভাইকে এ-বাড়িতে থাকার জন্য আনাল। তাদের নাম মাউ আর খাউ। তারা নাকি বখে যাচ্ছিল, সুতরাং ঠাঁইনাড়া করে তাদের শোধরানো দরকার। দুই ভাইয়েরই বেশ পালোয়ানের মতো চেহারা। খুব ডাকাবুকো ধরনের। বাড়িতে পা দিয়েই তারা নিরীহ গৌরগোপালকে নিয়ে পড়ল।

গৌর সাতে-পাঁচে থাকে না, সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু তাকে দেখলেই কেন যেন দাদার শালাদের মজা করার ইচ্ছে উসকে ওঠে। গৌর হয়তো বাগানের কাজ করছে, পিছন থেকে এসে তারা হয়তো তার কাছাটা টেনে খুলে দেয়। নয়তো তার ন্যাড়া মাথায় হঠাৎ একটু তেরে কেটে তাক বাজিয়ে চলে যায়। গৌর কিছু বলে না। একে কুটুম মানুষ, তার ওপর আবার বউদি বা দাদার কাছে সুবিচার পাওয়ার বদলে বকুনি খাওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি। তাই গৌরকে সয়ে যেতে হয়। শুধু তা-ই নয়, এই দুই বজ্জাতকে খুশি করার জন্য সে সেধে সেধে হেসে হেসে আগ বাড়িয়ে কথা বলতেও যায়। তাতে যে সবসময়ে লাভ হয় এমন নয়। মাউ আর খাউ বুঝে গেছে, গৌরগোপাল একটি আহাম্মক এবং বোকা। তার ওপর এ-বাড়িতে সে আছে আগাছার মতোই। সুতরাং গৌরকে তারা একদম পাত্তা দেয় না। তবে দরকারমতো তাকে দিয়ে পা দাবিয়ে বা পিঠ চুলকিয়ে নেয়। গৌর তাদের স্নানের আগে গায়ে তেল মাখায়, খাওয়ার সময় পাখা দিয়ে মাছি তাড়ায়। মাউ আর খাউ তাকে বাড়ির চাকরের মতোই ভাবে আর সেইরকমই ব্যবহার করে।

তবে কিনা গৌরগোপালের তাতে অপমানবোধ হয় না। এ-বাড়িতে সে যে থাকতে পারছে, তাকে যে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না, এইটেই তার কাছে ঢের বলে মনে হয়। জন্মাবধি এ-বাড়ির সঙ্গে তার নাড়ির সম্পর্ক।

মাঝে মাঝে নিঝুম রাতে গৌরগোপাল মায়ের দেওয়া কবচটা বের করে হাতের মুঠোয় করে চুপ করে বসে থাকে। সে কিছুতেই বুঝতে পারে না, মা তাকে এই কবচটা দিয়ে গেল কেন। তামার কবচটার মুখ ধূপের আঠা দিয়ে আটকানো। মাঝে মাঝে সে কবচটা নেড়ে বোঝবার চেষ্টা করে, ভিতরে কী আছে। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারে না।

এর মধ্যে একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। গৌরগোপাল খাউ আর মাউয়ের সঙ্গে পুকুরে স্নান করতে গেছে। তিনজনেই জলে দাপিয়ে স্নান করছে। হঠাৎ খাউ-মাউ দুই ভাইয়ের মজা উসকে উঠল। হঠাৎ দুজনে মিলে গৌরকে ধরে জলের মধ্যে চুবিয়ে রাখল। দুষ্টু বাচ্চারা এ-রকম একটু-আধটু করে, কিন্তু এ-খেলায় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে জীবন সংশয়। মাউ আর খাউয়ের সেই কাণ্ডজ্ঞান নেই। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে যে তিন মিনিটের বেশি কিছুতেই শ্বাস বন্ধ করে রাখা সম্ভব নয়, এটা বোধহয় তাদের জানাও ছিল না। দুই ভাই গৌরকে জলের তলায় চেপে রেখে হিহি করে হাসছিল।

ওদিকে জলের মধ্যে গৌর তখন আস্তে-আস্তে এলিয়ে পড়ছে। শ্বাস নিতে গিয়ে ঘাঁতঘাঁত করে জল গিলে ফেলছে। চেতনা আস্তে-আস্তে মুছে যাচ্ছে।

কাঠ কেটে, মাটি কুপিয়ে গৌরের গায়ে জোর কিছু কম হয়নি। তা ছাড়া জলে সাঁতার কেটে কেটে তার দমও হয়েছে অফুরন্ত। ইচ্ছে করলে সে খাউ আর মাউয়ের থাবা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে

পারত। কিন্তু ভালমানুষ গৌর মরতে মরতেও ভাবছে, 'যদি গায়ের জোর খাটাই তা হলে কুটুম-মানুষদের অপমান করা হবে। ওরা তো আমাকে নিয়ে একটু মজাই করছে। তার বেশি তো কিছু নয়। মজাটা যদি করতে না দিই তা হলে দাদা-বউদি বোধহয় রেগে গিয়ে তাড়িয়েই দেবে বাড়ি থেকে।' এই সব ভেবে গৌর আর নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করল না। খুব বিনয়ের সঙ্গে মরার জন্য চোখ বুজে ফেলল।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন পুকুরপাড়ে মেলা লোক জমেছে। তাকে উপুড় করে শুইয়ে গাঁয়ের চৌকিদার কুস্তিগির বাঁটুল তার পেটের জল বের করার জন্য পিঠের ওপর বসে দুমদাম কিল মারছে। বুড়ো কবিরাজমশাই তার নাড়ি ধরে বসে চোখ বুজে বিড়বিড় করে বলছেন, "এখনও ক্ষীণ...অতিক্ষীণ...নিমজ্জমান...।" তাঁর পাশেই ফকিরসাহেব তাঁর আরশিখানা নিয়ে বসে আছেন।

গৌরের জ্ঞান ফিরে এল বটে, কিন্তু বাঁটুলের কিলের চোটে আবার তার মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম। সে চেঁচিয়ে উঠল, "আমি বেঁচে আছি-ই! ওরে বাবা, মরলাম রে।"

সবাই হইহই করে উঠল: "বেঁচে আছে...বেঁচে আছে...!"

তা বেঁচে গেল বটে গৌর, কিন্তু তার বড় ভয় হতে লাগল। ওই দুই বজ্জাত কুটুমের পাল্লায় পড়ে একদিন বেঘোরে প্রাণটা না যায়।

ভেবেচিন্তে গৌর একদিন দুপুরে গোরু চরানোর সময় গাঙপারে ফকিরসাহেবের থানে হানা দিল। আড়াইশো বছর বয়সি ফকিরসাহেব তখন একখানা আরশি মুখের সামনে ধরে কাঠের চিরুনিতে দাড়ি আঁচড়াচ্ছেন। ওই আরশি আসলে ভূতের কল। যেখানে যত লোক মরে, ফকিরসাহেব গিয়ে তার আত্মাটাকে আরশিতে ভরে ফেলেন। এইভাবে ওই আরশিতে এ-যাবৎ কয়েক হাজার ভূত জমা হয়েছে।

গৌর ফকিরসাহেবের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বলে, "আজ্ঞে আমাকে একটা ভয়-তাড়ানোর তেল দেবেন?"

ফকিরসাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, "তোর ভয়টা কীসের?"

"আজ্ঞে খাউ আর মাউ বড্ড অত্যাচার করে। কুটুম-মানুষ, কিছু বলতেও পারি না। দেখলেন তো সেদিন জলে চুবিয়ে মারার জোগাড় করেছিল।"

ফকিরসাহেব খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, "তা সেদিন যদি মরতিস তো অমাবস্যার আগেই আমার পাঁচ হাজারটা ভূত পুরে যেত। যত নষ্টের গোড়া ওই কবরেজটা। তোর আত্মাটা শরীর ছেড়ে নাকের ফুটো দিয়ে বের হওয়ার জন্য সবে মাথাটা গলিয়েছে, আর ঠিক সেই সময়ে কবরেজ এমন একটা পাঁচন খাইয়ে দিলে যে, বাপ-বাপ করে আত্মাটা আবার সেঁধিয়ে গেল ভিতরে।"

গৌর চোখ বড় বড় করে বলে, "আমার আবার ভয় করতে লেগেছে ফকিরবাবা।"

"খাউ আর মাউটা কে বল তো!" ফকিরসাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

"বউদির ভাই।"

"তা ওদের ও-রকম নাম কেন?"

"সে জানি না। তবে তিন ভাইয়ের নাম হাউ, মাউ আর খাউ। বড়জন হাউ এখন জেলখানায় আছে। ডাকাতির আসামি। খালাস পেয়ে সেও নাকি এসে জুটবে। ফকিরবাবা, আমি বোধহয় বেশিদিন আর বাঁচব না।"

ফকিরসাহেব মোলায়েম গলায় বললেন, "বেঁচে থেকে হবেটা কী? বেঁচে থাকলেই খিদে পায়, খাটতে হয়, লোকের সঙ্গে ঝগড়া লাগে। তার চেয়ে মরে ভূত হয়ে আমার আরশিতে ঢুকে পড়, সুখে থাকবি।"

"তা না হয় থাকব ফকিরবাবা, কিন্তু বেঁচে থাকার দু-একটা সুখ না করে আমি মরতে পারব না।"

ফকিরসাহেব ভ্রূ কুঁচকে বলেন, "বেঁচে থাকায় আবার সুখ কী রে! মরলেই সুখ।"

"কিন্তু আমি যে জীবনে কখনও পোলাউ খাইনি, চন্দ্রপুলি খাইনি, লুচি দিয়ে পায়েস খাইনি, মোটরগাড়িতে চাপিনি, ঢেউপুরের রথের মেলায় সার্কাসের খেলা দেখিনি। আগে এ-সব হোক, তারপর মরব।"

ফকিরসাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ছেলেমানুষ। একেবারে ছেলেমানুষ। তা যা, ভয় তাড়ানোর তেল একটু দিয়ে দিচ্ছি।" বলে ফকিরসাহেব উঠে ঘর থেকে এক শিশি তেল এনে মন্ত্র পড়তে লাগলেন, "যন্তর-মন্তর-তন্তর সার, ভয়ভাবনা পগার পার। রাক্ষস-খোক্ষস, দত্যিদানো, হাউ-মাউ-খাউ যতই আনো। ভূত-পেতনি, ডাকাত-তস্কর, তফাত হ রে যত ভয়ংকর। বৃশ্চিক, সর্প, সিংহ, ব্যাঘ্র, দূর হয়ে যা শীঘ্র শীঘ্র। নিশুত রাত্রি, অমাবস্যা, হয়ে যা রে একদম ফরসা।" তিনটে ফুঁ দিয়ে ফকিরসাহেব তেলটি তার হাতে দিয়ে বললেন, "কবরেজটার কাছে একদম যাবি না। আর রোজ এক ঘটি করে টাটকা দুধ দুয়ে দিয়ে যাবি সক্কালবেলায়।"

গৌর ঘাড় নেড়ে তেল নিয়ে ফকিরসাহেবের কাছ থেকে বিদেয় হল।

বিকেলে যখন গৌর খিদে-পেটে গোরু চরিয়ে ফিরছে, তখন মহাকাল-মন্দিরের সামনের রাস্তায় কবরেজমশাইয়ের মুখোমুখি পড়ে গেল।

কবরেজমশাই নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকতে শুঁকতে বললেন, "উঁ! উঁ! মহামাস তেলের গন্ধ পাচ্ছি। এই ছোঁড়া, কার গা থেকে গন্ধটা আসছে রে?"

ভয়ে ভয়ে গৌরগোপাল বলে, "আজ্ঞে আমার গা থেকে।"

"তুই এ তেল পেলি কোথায়?"

"ফকিরসাহেব দিয়েছেন। তবে এ মহামাস তেল নয় কবরেজমশাই, এ হল ভয়তাড়ানো তেল। অনেক মন্তর লাগে।"

কবরেজমশাই হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, "ফকরেটা তাই বলে বুঝি! ত্যাঁদড় তো কম নয়। এই তো বোধহয় গত মঙ্গলবার আমাকে অনেক তোতাই-পাতাই করে পুরনো মহামাস তেলটা ধারে নিয়ে গেল। সেটাই ভয়তাড়ানো তেল বলে বেচেছে বুঝি!"

গৌর ঘাড় চুলকোতে থাকে।

কবরেজমশাই হুংকার দিয়ে বলেন, "তোর আবার ওটার কাছে যাওয়ার দরকারই বা পড়ল কেন? ভয় পাচ্ছিস বুঝি? কীসের ভয়?"

"আমার অনেকরকম ভয় কবরেজমশাই।"

"দেখি তোর নাড়িটা।" বলে কবিরাজমশাই অনেকক্ষণ ধরে গৌরগোপালের নাড়ি ধরে চোখ বুজে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "প্রাণপাখিটা যে বড্ড ডানা ঝাপটাচ্ছে রে। ভয় হওয়ারই কথা কিনা।"

"তবে কী হবে কবরেজমশাই?"

"বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকগে। আজ আর কিছু খাসনে। কাল একটা পাঁচন তৈরি করে রাখব'খন, এসে নিয়ে যাস। আর ওই ফকরেটার কাছে কখনও যাবি না। জ্যান্ত মানুষ ওর ভালই লাগে না। মানুষ মরলে পরে ওর আনন্দ হয়।"

"যে আজ্ঞে।"

"তোদের পিছনের আমবাগানে একটা মস্ত মৌচাক দেখেছিলাম যেন।"

"ঠিকই দেখেছেন।"

"পিছনের পুকুরটায় খুব পদ্মফুল ফোটে, না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তা হলে পদ্মমধুই হবে। খানিকটা দিস তো।"

ঘাড় নেড়ে গৌরগোপাল বাড়ির পথ ধরল। কবিরাজমশাই কিন্তু খেতে বারণ করেছেন। কিন্তু খিদের চোটে গৌরের বত্রিশ নাড়ি পাক দিচ্ছে। সকালে যে তেঁতুল-পান্তা খেয়েছিল, সারাদিন রোদে রোদে মাঠে ঘুরে তা কখন তল হয়ে গেছে। উপোস করলে কি আর রক্ষে আছে!

তবু গৌর বাড়ি ফিরে গোয়ালে সাঁজাল দিয়ে পেটব্যথা বলে ঘরে গিয়ে শুয়ে রইল।

গাঁ-গ্রামের লোকেরা সন্ধের পরই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। বাতি জ্বালাবার খরচ অনেক। সন্ধের পর কাজটাই বা কী?

কিন্তু গৌরের ঘুম আসার নাম নেই। ঘড়ি ঘড়ি উঠে খিদের জ্বালায় জল খাচ্ছে। সাত ঘটি জল খেয়ে ফেলল, কিন্তু খিদে মেটবার নামটিও নেই। রাত যখন নিশুতি হয়ে এসেছে, তখন গৌর আর পারল না, উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

বেশ ফটফটে জ্যোৎস্না উঠেছে। সাদা উঠোনটা ধবধব করছে চাঁদের আলোয়।

গৌর চুপিচুপি গিয়ে রান্নাঘরের শিকল খুলে ঢুকল। সে জানে, রান্নাঘরে কিছুই থাকে না। চোরের ভয়ে বাসনকোসন রাখা হয় না এ-ঘরে। তবে মাটির গামলায় কিছু ভাতের ফ্যান হয়তো রাখা আছে, এই ভেবে গৌর মাটির গামলাটা তুলে দেখল। না, নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গৌর বেরিয়ে আসছিল। বাগানের গাছে ফলটল আছে। কিন্তু রাত্রিবেলা গাছের গায়ে হাত দিতে নেই। বউদির ঘরে যদিও-বা মুড়ি-বাতাসা কিছু থেকে থাকে কিন্তু তার নাগাল পাওয়া অসম্ভব।

রান্নাঘরের শিকলটা তুলে দিয়ে গৌর উঠোনে নামবার জন্য পা

বাড়িয়েও থেমে গেল। উঠোনের পশ্চিম দিকে দরজা খোলার শব্দ হচ্ছে। গৌর ছায়ায় সরে দাঁড়ায়।

দরজা খুলে খাউ আর মাউয়ের ঘর থেকে ঢ্যাঙামতো একটা লোক বেরিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে উঠোনটা পেরিয়ে চলে গেল। জ্যোৎস্নায় লোকটার মুখ ভাল দেখা গেল না বটে, কিন্তু গৌরের মনে হল, লোকটার মুখে দাড়ি আছে। আর চোখ দুটো মনে হল বেশ গর্তে ঢোকানো। লোকটা উঠোন পেরোবার সময় চারদিকে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে যাচ্ছিল।

গৌর এ-রকম ঢ্যাঙা লোক এ অঞ্চলে আর দেখেনি। লোকটা চলে যেতেই খাউ আর মাউয়ের ঘরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

এই নিশুতি রাতে এ-রকম একটা অদ্ভুত লোক ওদের ঘরে এসেছিলই বা কেন আর চুপিচুপি চলেই বা গেল কেন, তা ভেবে পেল না গৌর। ভাববার মতো শরীরের অবস্থাও নয় তার। খিদের চোটে পেট থেকে গলা অবধি তার আগুন জ্বলছে।

ঘরে এসে সে ঘুমোবার চেষ্টা করল। না, ঘুম আসছে না। উঠে একটু পায়চারি করল। তাতেও হল না। তখন সে খুব কষে কয়েকটা বুকডন আর বৈঠক দিয়ে নিল। তাতে হল হিতে বিপরীত। খিদেটা রাক্ষসের মতো হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ করে তার পেটটাকে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল।

গৌর কুলুঙ্গিতে পটের পিছনে লুকোনো কবচটা বের করে হাতের মুঠোয় ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "মা, তুমি বেঁচে থাকতে কখনও খাওয়ার কষ্টটা হয়নি। এবার যে খিদেয় বাঁচি না। বাঁচিয়ে দাও মা।"

খিদেটা তাতে মরল না বটে, কিন্তু কবচটা হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে থাকতে থাকতেই গৌর কাহিল হয়ে শুয়ে পড়ল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তা আর তার খেয়াল নেই।

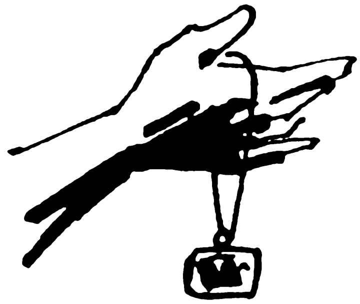

পেটে ভাত নেই বলে গৌরের ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। শরীরটা বেশ কাহিল লাগছিল। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। বাইরে এসে গৌর অভ্যাসবশে গিয়ে গোয়ালঘরে ঢুকল।

গোরুদের সঙ্গে গৌরের ভারী ভাবসাব। তাদের দুটো গোরু, দুটো বাছুর। গৌরকে দেখলেই তারা ভারী চঞ্চল হয়ে ওঠে। গা শুঁকে, চেটে, কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নানারকমভাবে তাদের আদর জানায়। পশুপাখিরাও মানুষ চেনে। গৌর গোরুদের গায়ে হাত বুলিয়ে, গলকম্বলে সুড়সুড়ি দিয়ে আদর করে বলল, "বড্ড খিদে পেয়ে গেছে তোদের, না রে? চল, আগে তোদের জাবনা দিই।" বড় গোরুটা এই কথা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

গোরুদের জাবনা দিতে দিতে গৌরের সেই লম্বা লোকটার কথা মনে পড়ল। মাউ আর খাউয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে লোকটা হনহন করে কোথায় যেন চলে গেল। চোর-ডাকাত নয় তো! কথাটা একবার তার দাদা নিতাইয়ের কানে তোলা দরকার। গাঁয়ের চোরদের সবাইকেই চেনে গৌর। তাদের সঙ্গে বেশ ভাবসাবও আছে। সুতরাং লোকটা গাঁয়ের আশপাশের গাঁয়েরও নয়। তা হলে লোকটা কে?

নিতাই যখন পুকুরের ঘাটলায় দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিল, তখন গৌর গিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, "দাদা, একটা কথা ছিল।"

নিতাই ভাইয়ের ওপর বিশেষ সন্তুষ্ট নয়। অন্য দিকে চেয়ে বলল,

"পয়সা-টয়সা চেয়ো না। অন্য কথা থাকলে বলতে পারো।"

"না, পয়সা নয়। আমি পয়সা দিয়ে কী করব! বলছিলাম কী, কাল রাতে বাড়িতে চোর এসেছিল।"

নিতাই আঁতকে উঠে বলে, "চোর! কোন চোর দেখেছিস?"

"চেনা চোর নয়। লোকটা খুব লম্বা, খাউ আর মাউয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দেখলাম।"

"তা হলে চেঁচাসনি কেন?"

"আমার প্রথমটায় মনে হয়েছিল, বোধহয় ওদের চেনা লোক। দরজা খুলে বেরোল, তারপর আবার ভিতর থেকে কে যেন দরজা বন্ধ করে দিল। তাই বুঝতে পারছিলাম না কী করব। যদি কুটুমদের চেনা লোক হয়, তা হলে চোর বলে চেঁচালে তাদের অপমান হবে।"

নিতাই দাঁতন করা থামিয়ে গৌরের দিকে চেয়েছিল। হঠাৎ বলল, "কীরকম চেহারাটা বললি?"

"খুব লম্বা আর সুড়ুঙ্গে।"

নিতাই গম্ভীর হয়ে বলল, "আজ রাত থেকে তোর ঘুমোনো বন্ধ। সারারাত জেগে লাঠি নিয়ে বাড়ি পাহারা দিবি। তোর বউদিকে বলে দিচ্ছি, আজ থেকে যেন তোকে রাতে ভাতটাত না দেয়। ভাতটাত খেলেই ঘুম আসে। পেটে একটু খিদে থাকলে জেগে থাকতে সুবিধে হয়।"

নিতাইয়ের কথা শুনে গৌরের মুখ শুকিয়ে গেল। একেই তো বউদি তাকে পেটভরে খেতে দেয় না বলে সারাদিন পেটের মধ্যে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে। তার ওপর রাতের খাওয়া বন্ধ হলে যে কী অবস্থা হবে! কিন্তু কী আর করা। গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাট্টি পান্তাভাত খেয়ে গোরু নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

নদীর ধারের মাঠে গোরুগুলিকে ছেড়ে দিয়ে গৌর গোবিন্দের বাড়ি গিয়ে হানা দিল। গোবিন্দ এই তল্লাটের সবচেয়ে পাকা চোর।

মাঝবয়সি। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখ দু'খানায় বুদ্ধির ঝিকিমিকি। চোর হলেও গোবিন্দ লোক খারাপ নয়। গৌরের মা বেঁচে থাকতে ভাগবত শুনতে যেত, মুড়ি-বাতাসা খেয়ে আসত।

গোবিন্দ উঠোনে বসে পাটের দড়ি পাকাচ্ছিল। গৌরকে দেখে খুশি হয়ে বলল, "আয়, বোস এসে। তা দাদা-বউদির সংসারে কেমন আছিস?"

গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "ভাল নয় গোবিন্দদা।"

"ভাল থাকবি কী করে? ওই যে দুটো গুন্ডাকে আনিয়ে রেখেছে তোর দাদা, ওরাই তোকে মেরে তাড়াবে। সাবধানে থাকিস।"

গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "তাড়াবে সে আর বেশি কথা কী? বেঁচে যে আছি, এই ঢের। আজ থেকে আবার রাতের খাওয়াও বন্ধ হল।"

"কেন, কেন?"

"কাল রাতে বাড়িতে চোর এসেছিল, সে-কথা দাদাকে বলায় দাদা রাতের খাওয়া বন্ধ করে সারারাত জেগে পাহারা দিতে হুকুম করেছে।"

"চোর!" বলে গোবিন্দ সোজা হয়ে বসল। তারপর বলল, "চোরকে দেখেছিস?"

"সেই কথাই তো বলতে এলাম। লম্বা, সুড়ুঙ্গে চেহারার বিটকেল একটা লোক রাতে খাউ আর মাউয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে চলে গেল। প্রথমটায় ভেবেছিলাম বুঝি ওদের কাছেই কেউ এসেছিল, চেনা লোকটোক হবে।"

"লোকটা যে চোর তা বুঝলি কী করে?"

"চোর কি না তা জানি না। তুমি এ-রকম চেহারার কোনও লোককে চেনো?"

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলল, "সে-কথা পরে হবে। আগে ভাল করে লোকটার চেহারাটা মনে করে বল।"

"খুব ভাল করে দেখিনি। জ্যোৎস্নার আলোয় আবছা-আবছা যা মনে হল, লোকটা তালগাছের মতো ঢ্যাঙা, রোগাটে চেহারা, লম্বা লম্বা পা ফেলে উঠোন পেরিয়ে চলে গেল। তারপর খাউ আর মাউয়ের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেলাম।"

গোবিন্দ দড়ি পাকানো বন্ধ করে গোল-গোল চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ভুরু কুঁচকে বলল, "ঢ্যাঙা লোক বললি? খুব রোগা?"

"সে-রকমই মনে হল।"

গোবিন্দ দু-একটা শ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বলল, "এ অঞ্চলের লোক হলে ঠিক বুঝতে পারতাম লোকটা কে। না রে, এ তল্লাটের লোক নয়। চোর বলেও মনে হচ্ছে না। চোর হলে দরজায় শব্দ হত না। তোর দাদার ওই দুই গুন্ডা শালার স্যাঙাত নয় তো?"

"তাও হতে পারে।"

"একটু নজর রেখে চলিস। ওদের বড়ভাইটা লোক ভাল নয়। সেটা এখন জেলখানায় আছে বটে, কিন্তু চারদিকে তার অনেক চ্যালা-চামুণ্ডা।"

"হাউয়ের কথা বলছ? তাকে চেনো নাকি?"

"খুব চিনি, হাড়ে হাড়ে চিনি। বিশাল লম্বাচওড়া চেহারা, গায়ে অসুরের মতো জোর। সেই জোর নিয়ে কী করবে তা ভেবে পায় না। তাই সবসময়ে একে মারছে, তাকে ধরছে, লোকের সঙ্গে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করছে। চুরি-ডাকাতি থেকে শুরু করে খুন অবধি কিছু বাকি নেই। হেন কাজ নেই যা ও করতে পারে না।"

গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "শুনছি জেল থেকে বেরিয়ে সেও এখানে আসছে।"

"আমিও শুনেছি। তোর দাদার মাথায় গোলমাল আছে বলেই শালাকে আদর করে এনে বসাতে চাইছে। কিন্তু এই আমি বলে

দিচ্ছি, হাউ যদি আসে তবে তোদের কাউকে আর ওই ভিটেয় তিষ্ঠোতে হবে না। এমনকী, গাঁয়ে লোক থাকতে পারবে কি না সন্দেহ।”

গৌর হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল।

গোবিন্দ তার দিকে চেয়ে বলল, “লম্বা লোকটা কে সেটা আমাকেও জানতে হচ্ছে। তুই ভাবিস না, আজ রাতে তোর সঙ্গে আমিও পাহারা দেব’খন।”

খানিকটা ভরসা পেয়ে গৌর উঠে গোরু চরাতে গেল।

গোরু চরাতে গৌরকে খুব একটা পরিশ্রম করতে হয়, তা নয়। গোরুগুলো আপনি ঘুরে ঘুরে মাঠের নধর ঘাস খেয়ে বেড়ায়। গৌর শুধু নজর রাখে যাতে ওরা হারিয়ে না যায় বা কারও বাগানে বা বাড়িতে না ঢোকে, কিংবা নালানর্দমায় না পড়ে-টড়ে যায়। গোরু মাঠে ছেড়ে দিয়ে গৌর প্রথমে জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে। দুপুরবেলাটায় তার বড় খিদে পায়। কিন্তু এত ঘনঘন খিদে পেলে তো চলবে না। দুপুরের ভাত সেই বেলা গড়ালে গিয়ে জুটবে। ততক্ষণে গৌর জঙ্গলে ঢুকে ফলটল খোঁজে। পেয়েও যায় মাঝে মাঝে। এক-এক সময়ের এক-এক ফল। কখনও কামরাঙা, কখনও আতা, তেঁতুল, বেল, মাদার বা ফলসা। চুনোকুল আর বনকরমচাও মিলে যায় কখনও-কখনও। তারপর একটা ঝুপসি গাছের তলায় শুয়ে সে কিছুক্ষণ ঘুমোয়।

আজ গৌর জঙ্গলে দুটো আতা পেয়ে গেল। ভারী মিষ্টি। খেয়ে গাছতলায় গামছা পেতে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গৌর স্বপ্ন দেখল, মা তার মাথার কাছটিতে এসে বসেছে। খুব মিষ্টি করে মা বলল, “কবচটা পরিসনি? ওরে বোকা! কবচটা সবসময়ে পরে থাকবি।”

ঘুম ভেঙে গৌর ধড়মড় করে উঠে বসল। তাই তো! কবচটার

কথা যে তার খেয়ালই ছিল না। ঘরে কুলুঙ্গিতে তুলে রাখা আছে।

দুপুরবেলা বাড়ি ফিরেই গৌর গিয়ে কুলুঙ্গিতে কবচটা খুঁজল। নেই। গৌর অবাক। কাল রাতে নিজের হাতে কবচটা এইখানে রেখেছে সে। গেল কোথায়? সারা ঘর এবং ঘরের আশপাশে আঁতিপাঁতি করে খুঁজল সে। কোথাও কবচটা খুঁজে পেল না। বুকটা ভারী দমে গেল তার। চোখে জল এল। কবচটার মধ্যে যে বিশেষ কোনও গুণ আছে, তেমন তার মনে হয় না। তবে মায়ের দেওয়া জিনিসটার মধ্যে মায়ের একটু ভালবাসা আর আশীর্বাদও তো আছে।

ঢাকা ভাত রান্নাঘরে পড়ে ছিল। গৌর স্নান সেরে কড়কড়ে সেই ঠান্ডা ভাত একটু ডাল আর ডাঁটাচচ্চড়ি দিয়ে কোনওক্রমে গিলেই ফকিরসাহেবের কাছে দৌড়োল, লোকে বলে ফকিরসাহেব তাঁর আরশিখানার ভিতর দিয়ে তামাম দুনিয়ার সব জিনিস দেখতে পান। হারানো জিনিসের সন্ধান তাঁর মতো আর কেউ দিতে পারে না।

ফকিরসাহেব এই দুপুরেও আরশিখানা হাতে নিয়ে দাওয়ায় বসে ছিলেন। চোখ দুটো ঢুলঢুলু, মুখে পান।

"ফকিরসাহেব! ও ফকিরসাহেব!"

ফকিরসাহেব একটু চমকে উঠে বললেন, "কে রে! গৌর!"

"আমার একটা জিনিস হারিয়েছে ফকিরবাবা।"

ফকিরসাহেব একটা হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বললেন, "হারিয়েছে না চুরি গেছে? ঘর থেকে না বার থেকে? ধাতুদ্রব্য না অধাতুদ্রব্য? ভারী না হালকা? চকচকে না ম্যাটমেটে?"

"একটা কবচ ফকিরবাবা। একটা তামার কবচ। আমার মা মরার আগে দিয়ে গিয়েছিল।"

কথাটা শুনে ফকিরসাহেব কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলেন। সেই হাঁ দেখে গৌরের মনে হয়েছিল, ফকিরসাহেব বুঝি আবার হাই

তুলছেন। কিন্তু এতক্ষণ ধরে কেউ তো হাই তোলে না! আর হাই তোলার সময়ে কেউ ওভাবে গুল্লু-গুল্লু চোখ করে চেয়েও থাকে না। গৌরের বেশ ভয়-ভয় করতে লাগল । ফকিরসাহেব হাঁ করে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ খিঁচিয়ে উঠে বললেন, "হারিয়ে বসলি? মুখ্যু গাধা কোথাকার!"

গৌর হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "আমার দোষ নেই। কুলুঙ্গিতে যত্ন করে রেখেছিলুম।"

ফকিরসাহেব মুখ ভেঙিয়ে বললেন, "কুলুঙ্গিতে রেখেছিলুম! মাথাটা কিনে নিয়েছিলে আর কী! কেন রে হতভাগা, কবচটা হাতে পরে থাকতে কী হয়েছিল?"

"আজ্ঞে, গোরুটোরু চরাই, বাসন-টাসন মাজি, কাঠটাঠ কাটি, কখন কোথায় ছিটকে পড়ে যায়, সেই ভয়ে হাতে পরিনি।"

ফকিরসাহেব দু'খানা হাত গৌরের মুখের সামনে নাচিয়ে বললেন, "উদ্ধার করেছ। এখন কী সর্বনাশ হয় দেখো।"

এই বলে গম্ভীর মুখে ফকিরসাহেব উঠে গিয়ে বারান্দার এক কোণে তামাক সাজতে বসলেন।

গৌর ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারল না। তবে কাঁচুমাচু মুখ করে বসে রইল চুপচাপ।

ফকিরসাহেব অনেকক্ষণ ধরে তামাক খেলেন। তারপর কলকে উপুড় করে রেখে নিমীলিত চোখে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বললেন, "ও কবচের কথা এ-গাঁয়ে মাত্র কয়েকজন জানে। এই ধর আমি, কবিরাজ, সুবল হোমিও, চোর গোবিন্দ, এমন ক'জন মাত্র। যারা জানে, তাদের বয়স এই আমারই মতো দেড়শো বা দুশো বছর।"

গৌর চোখ কপালে তুলে বলে, "গোবিন্দদার বয়স দেড়শো-দুশো?"

"এই সবে একশো একান্ন হয়েছে। আমার চেয়ে বাহান্ন বছরের ছোট। কবিরাজের বোধহয় একশো পঁচাত্তর চলছে, সেদিনের ছোকরা। সুবলের গত মাঘে দুশো হয়ে গেল।"

গৌর খুব ভক্তিভরে চেয়ে ছিল। বলল, "উরে বাবাঃ।"

"বয়সের কথাটা তুললাম কেন জানিস? তোদের ওই কবচটার ইতিহাস পুরনো লোক ছাড়া কেউ জানে না। আর ইতিহাসও সাংঘাতিক। তিনশো বছর আগে এই গাঁয়ে যোগেশ্বর নামে একজন লোক থাকতেন। সে কীরকম লোক তা এককথায় বলা মুশকিল। তবে আমরা তাঁকে আকাশে উড়তে, জলের ওপর হাঁটতে আর ডাঙায় ডিগবাজি খেয়ে খেয়ে চাকার মতো চলেফিরে বেড়াতে দেখেছি। তিনি আগুন দিয়ে বরফ জমাতে পারতেন, দিনদুপুরে অমাবস্যার অন্ধকার নামাতে পারতেন, একমুঠো ধুলো নিয়ে এক ফুঁ দিয়ে সোনার গুঁড়ো তৈরি করতেন। আমি, কবরেজ, গোবিন্দ, সুবল সব তার শাগরেদি করতুম। এই যে আরশিখানা দেখছিস, এ তাঁরই দেওয়া। কবরেজটা তেমন কিছু শিখতে পারল না বলে ওকে কবরেজির লাইনে ঠেলে দিয়েছিলেন তিনি। একখানা শিশিও দিয়েছিলেন ওকে, তাতে কী আছে জানি না। গোবিন্দ, সুবল, ওরাও কিছু-না-কিছু পেয়েছিল, তবে ও-সব গুহ্য কথা। তোর ঠাকুরদার ঠাকুরদাও ছিল তাঁর শাগরেদ। সে পেয়েছিল ওই কবচখানা। যাকে বলে জ্যান্ত কবচ। কবচের গুণাগুণ বলা বারণ, অত ভেঙে বলেনওনি যোগেশ্বরবাবা। তবে আমার ধারণা, ওই কবচ ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে মানুষের অসাধ্যি কিছু নেই। কিন্তু বংশের বাইরে কারও হাতে গেলেই সর্বনাশ।"

গল্প শুনে গৌর আর-একটু এগিয়ে বসল। বলল, "আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদাকে আপনি চিনতেন?"

"চিনব না মানে? এইটুকু দেখেছি।"

"তা যোগেশ্বরবাবার দয়ায় আপনারা সব এতকাল ধরে বেঁচে আছেন, তবে তিনি মরলেন কেন?"

"মরেছে! তোকে কে বলল যে, মরেছে! যোগেশ্বরবাবার যখন হাজার বছর বয়স পুরল তখন আমাদের ডেকে একদিন বললেন, 'ওরে আমার তো মরণ নেই, কিন্তু এই শরীরটা বড় পুরনো হয়ে গেছে। হাড়গুলোয় ঘুণ ধরেছে, চামড়াটাও বড্ড কালচে মেরে গেছে, মাংস যেন ছিবড়ে। তা এটাতে বাস করতে আর আমার মন চায় না। আজই এটা ছেড়ে ফেলব।' আমরা শুনে তাঁর হাতে-পায়ে ধরে অনেক কান্নাকাটি করলুম। তখন তিনি বললেন, 'মন যখন করেছি তখন ছাড়বই। ছেঁড়া, ময়লা, নোংরা জামা গায়ে পরে থাকতে যেমন ঘেন্না হয়, আমারও এই শরীরটা নিয়ে তাই হয়েছে। তবে তোরা দুঃখ করিস না, শরীর ছাড়লেও আমি কাছাকাছিই থাকব।' এই বলে তিনি পটাং করে শরীরটা ফেলে দিলেন। বাস্তবিকই শরীরটায় আর কিছু ছিল না, একেবারে চামচিকের মতো দেখতে হয়েছিল। আমরা সবাই খুব কান্নাকাটি করলুম। কিন্তু তোর ঠাকুরদার ঠাকুরদা ফটিক শোকে কেমন হয়ে গেল। যোগেশ্বরবাবার সেই শরীরখানা ঘাড়ে নিয়ে বিবাগি হয়ে গেল। সে মরেনি, দিব্যি আছে। আরশিখানার ভিতর দিয়ে তার সঙ্গে প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হয়, হিমালয়ে এক দুর্গম জায়গায় খুব জপতপ করছে ব্যাটা। এই আরশিখানা দিয়ে সব দেখা যায় কিনা।"

"তা হলে আমার কবচখানা কোথায় তা একটু দেখে দিন।"

ফকিরসাহেব মাথা নেড়ে বললেন, "ওটি হওয়ার জো নেই। এই আরশি দিয়ে আর সব দেখা গেলেও যোগেশ্বরবাবার মন্ত্রপূত জিনিস কোনওটাই দেখার উপায় নেই। এই ধর যেমন কবরেজের শিশি, ফটিকের কবচ, সুবল বা গোবিন্দর কাছে যা আছে সে-সব এই আরশিতে ধরা পড়বে না। তাই বলছি, কবচটা হারিয়ে খুব

গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছিস। এখন খুঁজেপেতে দেখগে কে নিল।”

ফকিরসাহেবের গল্প শুনে কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল গৌর। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে যায় না, আবার না করেই বা উপায় কী। বাড়ি ফিরে গৌর একডাঁই বাসন মাজল, উঠোন ঝাঁট দিল, গাছে জল দিল, গোরুকে জাবনা দিল। তারপর মাটি কোপাতে গেল বাড়ির উত্তর দিককার বাগানে। কবচখানার জন্য মনটা বড় খারাপ। মন খারাপ থাকলে গৌরের গায়ে বেশ জোর আসে, কাজও করে ফেলে চটপট। যে মাটি কোপাতে অন্য দিন সন্ধে হয়ে যায়, তা আজ গৌর এক লহমায় কুপিয়ে ফেলল।

গৌর কুয়োর পাড়ে যখন মাটিমাখা হাত-পা ধুচ্ছে, তখন নেতাইগোপাল এসে বলল, “মনে আছে তো?”

গৌর ঘাড় নেড়ে বলে, “আছে।”

“আজ রাত থেকে তোর খাওয়া বন্ধ। সারারাত ঘরদোর পাহারা দিবি। বসে বসে আবার ঢুলিস না যেন। সবসময়ে পায়চারি করবি আর মাঝে মাঝে লাঠি ঠুকবি। মনে থাকবে যা বললুম?”

গৌড় ঘাড় নেড়ে বলল, “থাকবে।”

সন্ধের পর গৌর চুপিসারে বেরিয়ে পড়ল কবরেজমশাইয়ের বাড়ির দিকে। পথেই বাজারের গা ঘেঁষে হরিপদর ফুলুরির দোকান। দারুণ করে। দেখল, সেখানে দাঁড়িয়ে মাউ আর খাউ খুব মনের সুখে ফুলুরি ওড়াচ্ছে। গৌর আড়াল হয়ে সুট করে কেটে পড়ল।

কবরেজমশাই বৈঠকখানায় বসে কী একটা ঘষছিলেন। সবসময়েই তিনি কিছু-না-কিছু বানিয়েই যাচ্ছেন। লতাপাতা, শেকড়বাকড়, ধাতু, পাথর, মধু, দুধ— এই সব সারাদিন একটার সঙ্গে আর-একটা মেশাচ্ছেন, জ্বাল দিচ্ছেন, পোড়াচ্ছেন। এ-রকম কাজপাগল লোক গৌর দুটো দেখেনি।

তাকে দেখে কবরেজমশাই হাতের কাজ থামিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "এঃ, তোর গা থেকে যে বড্ড ভূত-ভূত গন্ধ আসছে রে। ওই বুজরুক ফকরেটার কাছে গিয়েছিলি নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।"

"আবার সমস্যা কীসের?"

"আমার একটা জিনিস হারিয়েছে।"

"অ। তাই ফকরেটার কাছে গিয়েছিলি বুঝি? তা কী বলল বুজরুকটা?"

"আজ্ঞে সে মেলা কথা।"

"তা জিনিসটা পাওয়া গেল না তো!"

"আজ্ঞে না। যোগেশ্বরবাবার দেওয়া সেই কবচ নাকি ফকিরসাহেবের আরশিতে দেখা দেন না।"

কবিরাজমশাই এতক্ষণ দিব্যি সুস্থ-স্বাভাবিক ছিলেন। কবচের কথা শুনে আচমকা একটা 'আঁক' করে শব্দ তুললেন গলায়। তারপর বজ্রাহতের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন গৌরের দিকে। সেই দৃষ্টি দেখে গৌরের মনে হল, কবিরাজমশাই বুঝি বসে বসেই মূর্ছা গেছেন। ভয় খেয়ে সে কবিরাজমশাইয়ের গায়ে একখানা ঠেলা দিয়ে ডাকল, "কবরেজমশাই! ও কবরেজমশাই!"

কবিরাজমশাই চোখ পিটপিট করে খুব নিচু স্বরে বললেন, "সর্বনাশ!"

"ফকিরসাহেবও সেই কথাই বলছিলেন। কবচটা হারানো নাকি ঠিক হয়নি। কুলুঙ্গিতে পটের পিছনে কবচটা লুকোনো ছিল। হারানোর কথা নয়। তবু যে কী করে হারাল!"

কবিরাজমশাই খেঁকিয়ে উঠে বললেন, "কুলুঙ্গি! তোর কি মাথা খারাপ? ও জিনিস কেউ হেলাফেলা করে এখানে-সেখানে ফেলে রাখে?"

গৌর কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে, "এখন তা হলে কী হবে কবরেজমশাই?"

কবিরাজমশাই মুখ ভেঙিয়ে বলে উঠলেন, "কী হবে কবরেজমশাই! কী হবে তার আমি কী জানি রে লক্ষ্মীছাড়া? বেরো, বেরো, দুর হয়ে যা চোখের সামনে থেকে! হাঁদারাম কোথাকার!"

গৌর ভয় খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে ফিরে এল বাড়ি। বাড়িতে ঢুকতেই দেখল, বড় ঘরের বারান্দায় হ্যারিকেনের আলোয় তার দাদা নিতাই দুই শালাকে নিয়ে খেতে বসেছে। গরম ভাত আর ডালের গন্ধে ম' ম' করছে বাড়ি।

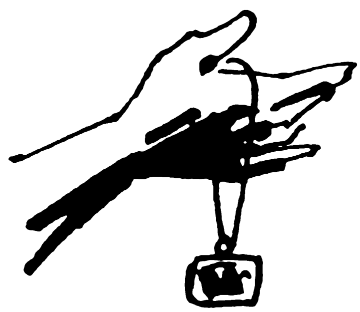

গৌর নিজের অন্ধকার ঘরখানায় ঢুকে একপেট জল খেয়ে বসে রইল। নিতাই আর তার দুই শালা আঁচিয়ে ঘরে ঢুকল। বউদি এঁটো সারছে। আজ আর তাকে কেউ খেতে ডাকল না। শুধু নিতাই নিজের ঘর থেকে একখানা হাঁক দিয়ে বলল, "গৌর, জেগে আছিস তো?"

গৌর ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "আছি।"

"এবার তা হলে রোঁদে বেরিয়ে পড়। আমরা ঘুমোচ্ছি।"

গৌর কী আর করে। লাঠিগাছ হাতে নিয়ে বেরোল। ঠিক নিতাই যেমন বলেছিল, তেমনি লাঠি ঠুকে ঠুকে চারদিক ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে লাগল।

তারপর শেয়াল ডাকল, প্যাঁচা ডাকল, ঝিঁঝি ঝিনঝিন করতে লাগল। ক্রমে রাত নিশুত হয়ে গেল। গৌরের পেট খাঁখাঁ করতে

লাগল খিদের চোটে। বড় ঘরের দাওয়ায় একটু জিরোতে বসল সে। তারপর কখন একটু ঢুলুনি এসে গেল।

আচমকা চটকা ভেঙে উঠে বসল সে। কীসের একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনেছে সে ঘুমের মধ্যে । অনেকটা দরজার শেকলের শব্দের মতো। লাঠি হাতে গৌর উঠে আর-একবার বাড়িটা একপাক ঘুরে দেখল। দরজা-জানালা সব ঠেলেঠুলে দেখল, সবই বন্ধ আছে। নিশ্চিন্ত হয়ে আবার সে দাওয়ায় বসে একটা হাই তুলল। গোবিন্দদা বলেছিল আসবে। এল না কেন তা বোঝা যাচ্ছে না।

ফের ঢুলুনি আসতে না আসতেই আবার শব্দ। শেকল নাড়ার শব্দ নয়, এবার বেশ মনে হল ধারেকাছে কেউ ফিসফাস করে কথা বলছে। গৌরের গায়ে একটু কাঁটা দিল। ভয়-ভয় করতে লাগল। আর-একবার লাঠি ঠুকে বাড়িটা চক্কর দিল সে। কোথাও কিছু নেই।

এবার গৌর দাওয়ায় একটু গা এলিয়ে দিয়ে বসল, শরীরটা ঝিমঝিম করছে খিদে আর ক্লান্তিতে। হাঁটাহাঁটি ভাল লাগছে না। ঢুলতে ঢুলতে গৌর কখন হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা আর খেয়াল নেই।

খাউ আর মাউ যে ঘরটায় থাকে, সেটা এ-বাড়ির সেরা ঘর। তবে পুরনো বাড়ি বলে জানালা-দরজা খুলতে বা বন্ধ করতে প্রচণ্ড ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হয়। আচমকা সেই শব্দ গৌরের ঘুমের মধ্যেও সেঁধোল গিয়ে। চটকা ভেঙে সে উঠে বসল। তারপরই দেখল, খাউ আর মাউয়ের ঘরের দরজা খুলে সেই লম্বা লোকটা বেরিয়ে আসছে। লোকটার পরনে একটা আলখাল্লার মতো লম্বা ঝুলের পোশাক। কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে লোকটা লম্বা লম্বা পা ফেলে উঠোনে নেমে চলে যাচ্ছিল।

গৌর কী করবে প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। হাতের লাঠিটার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে তাই সে হঠাৎ চিৎকার করার জন্য হাঁ করল।

কিন্তু সেই সুযোগ আর পেল না। পিছন দিক থেকে একটা হাত এসে তার মুখ খুব শক্ত করে চেপে ধরল। প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়ে আঁট হয়ে বসা হাতটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে জুত করতে পারল না গৌর। একে উপোসি শরীর, তার ওপর রাত জাগার ক্লান্তি। তবে বুদ্ধি করে সে ফুট করে একটা কামড় বসাল হাতটায়।

পিছন থেকে "উঃ" শব্দ শোনা গেল। তারপরই হাতটা সরে গেল মুখ থেকে। গোবিন্দ হাতটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "আর-একটু হলেই কাঁদিয়ে দিয়েছিলি আর কী।"

"ওঃ, গোবিন্দদা! তুমি কখন এলে?"

"এসেছি অনেকক্ষণ, তোর দাদা ঘুমোতে যাওয়ার আগে।"

"সে কী! টের পাইনি তো!"

"আমরা কি আর জানান দিয়ে আসি রে। লুকিয়ে লুকিয়ে নজর রাখছিলাম।"

"লোকটাকে দেখলে?"

গোবিন্দ একটা শ্বাস ফেলল, তারপর পাশে রাখা একটা পুঁটুলি খুলতে খুলতে বলল, "দেখেছি। এখন এই রুটি ক'খানা আর তরকারিটুকু খেয়ে নে তো।"

খাবার দেখে গৌরের চোখে জল এসে গেল। বলল, "ওঃ, খিদে যে কী জিনিস তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি গোবিন্দদা।"

"ভাবিস না, রাতের খাবারটা এখন থেকে রোজ আমিই এনে দেব'খন। এখন আর কথা নয়, আগে খা, মাথা ঠান্ডা হোক, বুদ্ধি খুলুক, তারপর কথা।"

গৌরকে দুবার বলতে হল না। আটখানা রুটি চোখের নিমেষে উড়িয়ে এক ঘটি জল খেয়ে ঢেকুর তুলে সে বলল, "লোকটা চোর নয়?"

গোবিন্দ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "জানি না।"

"তা হলে লোকটাকে ধরলে না কেন?"

"ধরা কি অত সোজা?"

"চেঁচালেও হত। লোকজন উঠে পড়ত, তারপর সবাই মিলে তাড়া করে ধরে ফেলতাম।"

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলে, "অত সোজা নয় রে। অনেক গুহ্য কথা আছে।"

গৌরের একটু অভিমান হল। সে বলল, "তোমরা সবাই আমার কাছে কী যেন একটা লুকোচ্ছ গোবিন্দদা।"

গোবিন্দ একটু হেসে বলে, "যদি লুকিয়েই থাকি তবে সে তোর ভালর জন্যই। এখন একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তোর মা মরার আগে যে কবচটা তোকে দিয়ে গেছে, সেটা কোথায়?"

"কবচ! সেই কবচ তো চুরি গেছে।"

"চুরি! বলিস কী?"

গৌর বিপন্ন গলায় বলে, "কবচ চুরি গেছে শুনে ফকিরবাবা আর কবরেজমশাইয়ের যে কী রাগ!"

গোবিন্দ কিছুক্ষণ গৌরের দিকে চেয়ে বলল, "রাগ না হওয়াই বিচিত্র কিনা। শুনে আমারও হচ্ছে। তা সেটা চুরি গেল কী করে?"

গৌর মাথা নেড়ে বলে, "জানি না। ঘরে ছিল, খুঁজে পাচ্ছি না।"

"তোর ঘরে তালা দেওয়া থাকে না?"

"বাড়িতে লোক থাকতে কেউ ঘরে তালা দিয়ে বেরোয়? তা ছাড়া আমাদের তালাটালা নেই, চোরের নেওয়ার মতো থাকেও না কিছু ঘরে। কিন্তু আগে বলো, কবচটা এমন কী দামি জিনিস যে চুরি গেছে শুনে তোমরা অত রেগে যাচ্ছ?"

গোবিন্দ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বলল, "সে তুই বুঝবি না। তবে কবচটা যে অমূল্য জিনিস তা আমরা জনাকয় লোক ছাড়া আর কেউ জানে না। তা হলে একটা সামান্য কবচ চুরি করতে কে আসবে বল তো! যারা জানে তারা সব আমার মতোই বুড়োটুড়ো লোক, আমি ছাড়া চুরি করার এলেমও কারও নেই। আর চুরি করে লাভও নেই, যার কবচ সে ছাড়া অন্য কারও হাতে গেলে তার সর্বনাশ হবে, এও আমরা জানি।"

গৌর বলল, "তা হলে?"

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলল, "চুরি যায়নি। কোথাও আছে। খুঁজে দেখতে হবে।"

"আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি।"

"তোর খোঁজা আর আমার খোঁজায় তফাত আছে।"

"তুমি খুঁজবে?"

"খুঁজতেই হবে রে। এখন দাওয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে থাক। আজ রাতে আর কোনও উপদ্রব হবে বলে মনে হয় না। আমি সকালবেলায় আসব'খন।"

গোবিন্দ নিঃশব্দে চলে গেল। গৌর আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে হাই তুলে দাওয়ায় এলিয়ে পড়ল। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা টেরও পেল না।

ঘুম ভাঙল মাজায় দুটো মোক্ষম লাথি খেয়ে! সঙ্গে বাজখাঁই গলা, "অ্যাই গাধা, ঘুমোচ্ছিস যে বড়! তোকে না জামাইবাবু পাহারা দিতে বলেছে?"

গৌর ঘুম ভেঙে উঠে বসে হাবার মতো তাকিয়ে দেখে, সামনে মাউ আর খাউ দাঁড়িয়ে। এখনও ভোর হয়নি। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। দুঃখে তার চোখ ফেটে জল এল। রাগও হল খুব। তেজের গলায় বলল, "আমাকে লাথি মারছ কেন? তোমাদের ঘরে চোর আসে, তোমরা পালা করে পাহারা দিলেই পারো।"

এ-কথায় দু'ভাই একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। মাউ বলল, "আমরা না তোদের কুটুম! আমাদের বাড়ি পাহারা দিতে বলিস, এত বড় সাহস! বড় বড় কথা বলছিস, দেব জামাইবাবুকে বলে? একবেলা খাওয়া জুটছে, তাও বন্ধ হয়ে যাবে।"

গৌর জানে কথাটা ঠিকই। সে নিতাইগোপালের মায়ের পেটের ভাই হলে কী হবে, নিতাই তাকে মানুষ বলেই জ্ঞান করে না।

অসহায় গৌর কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছে উঠে পড়ল।

উঠতেই মাউ তার চুলের মুঠিটা ধরে মোলায়েম করে একটা নাড়া দিয়ে বলল, "এবার বলো তো বাছাধন, আমাদের ঘরে যে চোর আসে, সেটা আর কে কে জানে!"

গৌর কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে, "দাদা জানে।"

"শুধু দাদা? আর কেউ না?"

গৌর ভয় খেয়ে বলল, "না।"

"তুই চোরকে দেখেছিস? বল তো কেমন চেহারা?"

এবার চুলের টানে গৌরের চোখে নতুন করে জল এল। বলল, "লম্বা সুড়ুঙ্গে একটা লোক।"

"সে যে চোর, তা কী করে বুঝলি?"

"চোরের মতোই মনে হল যে! নিশুত রাতে তোমাদের ঘর থেকে বেরোল।"

"তুই ভুল দেখেছিস।"

গৌর হাঁ করে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, মাউ তার ঝুঁটিটা ধরে এত জোরে নাড়া দিল যে, পটপট করে কয়েকটা চুল ছিঁড়ে গেল, কতকগুলোর গোড়া আলগা হয়ে গেল। গৌর "বাপ রে" বলে চাপা আর্তনাদ করল একটা। মাউ কঠিন গলায় বলল, "চেঁচাবি তো গলা টিপে মেরে ফেলে দেব। এখন যা জিজ্ঞাসা করছি, ঠিকঠাক জবাব দে। লোকটা আজ এসেছিল?"

"এসেছিল।"

"তা হলে চেঁচাসনি কেন?"

গৌর চেঁচাতেই চেয়েছিল, কিন্তু গোবিন্দ চেঁচাতে দেয়নি। কিন্তু সেই কথাটা মাউকে বলে কী করে গৌর। তাই হাত দিয়ে চোখের জল মুছে ধরা গলায় বলল, "ভয় পেয়েছিলাম।"

"ভয় পেলে পাহারা দিস কী করে? তোর দাদাকে বলে দেব যে,

তুই চোরকে দেখেও চেঁচাসনি বা ধরার চেষ্টা করিসনি?"

"বোলো না। তা হলে দাদা তাড়িয়ে দেবে।" গৌর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল।

গৌরের কান্না দেখেও মাউ চুলের মুঠি ছাড়ল না, বরং আরও শক্ত হাতে চুলের গোছা চেপে ধরে বলল , "তা হলে আমাদের কথা শুনে চলতে হবে। যা বলব তা-ই করতে হবে। রাজি?"

চুলের টানে গৌরের বোধবুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছিল। চিঁচিঁ করে বলল, "রাজি। আমাকে খামোখা মারছ কেন? আমি তো কিছু করিনি।"

"করেছিস বই কী! যে ব্যাপারে তোর নাক গলানো উচিত নয়, তাইতে নাক গলিয়েছিস। এখন আমাদের কথায় রাজি না হলে একদম শেষ করে পাঁকে পুঁতে দেব। বুঝলি?"

গৌর বুঝেছে। না-বুঝলেও বুঝেছে। বলল, "আচ্ছা।"

মাউ চুল ছেড়ে দিয়ে বলল, "আমাদের সঙ্গে আয়।"

গৌরকে নিজেদের ঘরে নিয়ে গিয়ে মাউ আর খাউ দরজাটা বন্ধ করে দিল, তারপর মাউ বলল, "বোস।"

গৌরের চুলের গোড়াগুলো ফুলে উঠেছে। একশো ফোড়ার যন্ত্রণা তার মাথায়। মাথায় চিন্তাভাবনা কিছু আসছে না। চুপ করে ভ্যাবলার মতো বসে রইল সে।

মাউ হ্যারিকেনটা একটু উসকে দিয়ে গৌরের দিকে আগুন-চোখে চেয়ে রইল। মাউ আর খাউ পাজি বটে, কিন্তু এ-রকম ঠান্ডা খুনির মতো চেহারা তাদের কখনও দেখেনি গৌর। এ যেন অন্য জগতের দুটো মানুষ। চোখ ধকধক করে জ্বলছে, কপালের শিরা ফুলে উঠেছে, চিতাবাঘের মতো থাবা পেতে আছে যেন, একটু বেয়াদবি করলেই লাফিয়ে পড়বে।

মাউ চাপা গলায় বলল, "যাকে তুই দেখেছিস, সে চোর নয়। আমাদের কাছে প্রায়ই আসবে। গভীর রাত্রেই আসবে। কিন্তু

খবরদার, তাকে দেখে একটি শব্দও করবি না। যদি করিস তা হলে তার কিছুই হবে না, কেউ ধরতে পারবে না তাকে, কিন্তু তোর দারুণ বিপদ ঘটবে। বুঝেছিস?"

গৌর সম্মোহিতের মতো মাউয়ের দিকে চেয়ে ছিল। মাথা নেড়ে বলল, "বুঝেছি।"

"আর-একটা কথা। এ-সব ব্যাপার যদি বাইরের কেউ জানতে পারে, তা হলে কিন্তু..." মাউ কথাটা শেষ না করে অর্থপূর্ণ চোখে গৌরের দিকে চাইল।

গৌর মাথা নেড়ে বলে, "কেউ জানবে না।"

"ঠিক বলছিস?"

"দিব্যি করে বলতে পারি।"

"তোর দিব্যির কোনও দাম আছে নাকি? সে যাকগে, দিব্যি-টিব্যি করতে হবে না। শুধু বলে দিচ্ছি, তার কথা কেউ জানলে তোর গলার ওপর মাথাটা আর থাকবে না। যদি প্রাণে বাঁচতে চাস তো মুখে কুলুপ এঁটে রাখিস। এখন যা।"

গৌর পালিয়ে বাঁচল। নিজের ঘরে এসে দু'ঘটি জল খেল, তারপর বসে বসে ব্যাপারখানা ভাবতে লাগল। ব্যাপারটা যে জটিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এ-বাড়িতে আর থাকাটাই তার পক্ষে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই বাড়িতেই তার জন্ম, এই গাঁয়েই সে এত বড়টি হয়েছে। এ-জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে তার একটুও ইচ্ছে করে না। এ-বাড়িতে তারও অধিকার আছে। মাউ আর খাউ উটকো লোক, তাদের ভয়ে নিজের বাপ-পিতামহের ভিটে ছেড়ে পালাতেও ইচ্ছে করে না। এই বাড়ি, এই গাছপালা, এরা সব যেন তার বন্ধু, তার আপনজন। ভাবতে ভাবতে তার চোখে জল এল। আপনমনে নিজের মাথায় একটু হাত দিল সে। চুলের গোড়ায় রক্ত জমে আছে, সাংঘাতিক ব্যথা।

কী করবে বুঝতে না পেরে গৌর কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। তারপর আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। ভোরের দিকে একটু ঢুলুনি এসেছিল তার। তখন স্বপ্নে তার মা দেখা দিল। মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "বড্ড লেগেছে বাবা? তা কবচটা হারিয়ে ফেললি, কী যে করি তোকে নিয়ে! একটা কথা বলি শোন, রাজা রাঘব কিন্তু ভাল লোক নয়। তাকে কখনও বিশ্বাস করিস নে।"

ঘুম ভেঙে গৌর দেখল, ভোর হয়ে গেছে। গোয়ালে গোরুগুলো ডাকাডাকি করছে খুব। গৌর তাড়াতাড়ি উঠে বাসন-টাসন মেজে, ঝাঁটপাট দিয়ে, পান্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল গোরু নিয়ে।

নদীর ধারে একটা বেশ বড় বটগাছ আছে। গোরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে সেই বটগাছের ছায়ায় বসে গৌর কাল রাতের কথা, স্বপ্নের কথা, সব ভাবছিল। মা স্বপ্নে এসে বলল, "রাজা রাঘব ভাল লোক নয়।" কিন্তু রাজা রাঘবটা কে? সে তো এ-রকম কোনও রাজার নামই শোনেনি।

বটের ছায়ায় বসে একটু ঝিমুনি এসেছিল গৌরের। হঠাৎ একটা কর্কশ গলা-খাঁকারির শব্দে চোখ চাইল। বটগাছের কাছেই একটা বহু পুরনো ঢিবি। রাখালরা ওখানে লুকোচুরি খেলে। সেই ঢিবির চুড়োয় একটা শুঁটকো চেহারার বুড়ো লোক দাঁড়িয়ে জুলজুলে চোখে তাকে দেখছে। পরনে চোগা-চাপকান, হাতে লাঠি। গৌর চমকে উঠে বসতেই বুড়ো লোকটা ঢিবির আড়ালে ওধারে নেমে গেল ধীরে-ধীরে।

দুপুরবেলা ফেরবার পথে গৌর ফকিরসাহেবের থানে আবার হানা দিল। লোকটা বুজরুক হোক, মিথ্যেবাদী হোক, বেশ মজার লোক। তাকে গৌরের ভালই লাগে।

"ও ফকিরবাবা।"

ফকিরসাহেব একটা পুরনো পুথি পড়ছিলেন। চোখ তুলে অবাক

হয়ে বললেন, "বেঁচেবর্তে আছিস এখনও। শুনলুম কাল রাতে মাউ আর খাউ তোকে ভালরকম ডলাই মলাই করেছে। তা মরিসনি কেন? মরলে এতক্ষণে দিব্যি আমার আরশিনগরে থাকতে পারতি। তা বৃত্তান্তটা কী?"

গৌর অবাক হয়ে বলে, "ডলাই মলাই নয়, চুল ধরে খুব টেনেছে। কিন্তু সে-কথা আপনি জানলেন কী করে?"

ফকিরসাহেব খুব হেঃ হেঃ করে হেসে বললেন, "আমার আরশিখানা যে সবজান্তা রে।"

কথাটা ঠিক বিশ্বাস হল না গৌরের, আবার অবিশ্বাসই বা করে কী করে? একটু মাথা চুলকে সে বলল, "কাল রাতে মাকে স্বপ্নে দেখলাম। তা মা বলল, রাজা রাঘব নাকি খুব খারাপ লোক। কিন্তু মুশকিল হল, রাজা রাঘব লোকটা যে কে, তা-ই আমি বুঝতে পারছি না। আপনি জানেন ফকিরবাবা।"

ফকিরসাহেবের মুখখানা দিব্যি হাসি-হাসি ছিল এতক্ষণ। কানের আতর-ভেজানো তুলো থেকে দিব্যি সুবাস আসছিল। তেল-চুকচুক করছিল মুখখানা। রাজা রাঘবের নামটা শুনেই কেমন যেন হত্তুকির মতো শুকিয়ে গেল। ফকিরসাহেব একটা ঢোক গিলে বললেন, "তোর মা বলল? অ্যাঁ! ওরে বাবা! তা কী বলল বল তো! রাঘব আসছে নাকি?"

"তা আমি জানি না। মা শুধু সাবধান করে দিয়ে গেল। কেন ফকিরবাবা, রাঘবরাজা কি খুব সাংঘাতিক লোক?"

ফকিরসাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর মাথায় হাত দিয়ে বসে অনেকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর আপনমনে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, "ঈশানকোণে রক্তমেঘ! আগেই জানতুম, আর বেশিদিন নয়। লেগে যাবে সুন্দে-উপসুন্দে। গাঁ ছারখার হয়ে যাবে। ওরে বাবা!"

গৌর হাঁ করে ফকিরসাহেবের মুখের দিকে চেয়ে ছিল। বুঝতে পারছিল না, ব্যাপারখানা কী।

ফকিরসাহেব বিড়বিড় করা থামিয়ে তার দিকে বড় বড় চোখ করে চেয়ে বললেন, "এখনও বসে আছিস যে বড়! এখনই গিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে মরে যা। কোনও ভয় নেই, মরতে না মরতেই আমি আত্মাটাকে চিমটে দিয়ে ধরে বের করে এনে আরশিতে পুরে ফেলব।"

"মরব ফকিরবাবা? কেন?"

"বেঁচে থেকে আর সুখ কী রে? সে যদি এসেই যায়, তবে বেঁচে থেকে আর সুখ কী? গাঁ কে গাঁ শ্মশান হয়ে যাবে।"

"রাঘব কে ফকিরবাবা?"

"ওরে বাবা, সে আমি জানি না।"

"এই যে এতক্ষণ বিড়বিড় করে কী সব বলছিলেন, যা শুনে মনে হল, রাঘবরাজা খুব খারাপ লোক।"

ফকিরসাহেব নিজের কানে হাতচাপা দিয়ে বললেন, "ভুল বলেছি তা হলে। ও কিছু নয়। তুই বাড়ি যা তো, বাড়ি যা।"

গৌর বেজার মুখে উঠে পড়ল।

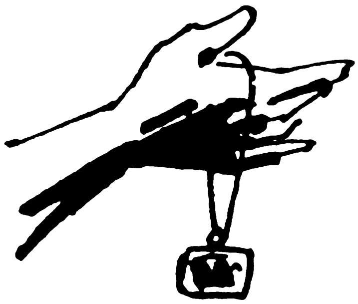

দুপুরবেলা ভাত খেয়ে গৌর যখন পুকুরে বাসন মাজছে, তখন দেখল, পাশের কচুবনের মধ্যে একটা লোকের মাথা। উবু হয়ে হয়ে কী যেন খুঁজছে। কৌতূহলী হয়ে গৌর উঠে ভাল করে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করতে করতে বলল, "ওখানে কে গো?"

লোকটা মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে একটা ধমক দিল। "কাজের সময় কেন যে এত চেঁচামেচি করিস।"

গৌর দেখল, গোবিন্দদা। চাপা গলায় সে বলল, "গোবিন্দদা! ওখানে কী করছ তুমি?"

"করছি তোর মাথা আর মুণ্ডু! কাছে আয়।"

গৌর একটু অবাক হল। তারপর হাত ধুয়ে গুটিগুটি গিয়ে কচুবনে সেঁধোল। দেখল, গোবিন্দ একটা তামার ঘটে জল নিয়ে তার ওপর একখানা সিঁদুরমাখানো ছোট্ট আয়না ধরে চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কী যেন দেখছে। দেখতে দেখতে বলল, "সন্ধান প্রায় পেয়ে গেছি। পশ্চিম দিকেই ইশারা দিচ্ছে।"

গৌর উদ্‌গ্রীব হয়ে বলল, "কবচটা?"

"তবে আর কী খুঁজব রে গাড়ল! ইশ, কাল রাতে কী চোরের মারটাই না খেলি গুন্ডাদুটোর হাতে!"

"তুমি দেখেছ!"

"চোখের পাতা না ফেলে দেখেছি। প্রথম থেকে শেষ অবধি।"

গৌর অভিমানের গলায় বলল, "তবু আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করোনি? তুমি কেমনধারা ভালবাসো আমায়?"

গোবিন্দ খিঁচিয়ে উঠে বলে, "হ্যাঁ, তোকে বাঁচাতে গিয়ে দু-দুটো গুন্ডার হাতে হাড় ক'খানা ভেঙে আসি আর কী! তা তুইও তো ঘাড়েগর্দানে কম নোস, নিজেকে বাঁচাতে হাত-পা ছুড়তে পারলি না? নিদেন কামড়েও তো দিতে পারতিস!"

গৌর মুখ গোমড়া করে বলে, "সেটা পারলে আর কথা ছিল নাকি! ওরা কুটুম-মানুষ না! কুটুমের গায়ে হাত তোলে কেউ? আর তুললে দাদাই কি আমাকে আস্ত রাখবে?"

গোবিন্দ ভেবেচিন্তে বলল, "তা বটে। তা খেয়েছিস না হয় একটু মারধর। কিল, চড়, ঘুসি, চুলের গোছায় টান, এ-সব এমনিতে খেতে ভাল লাগে না বটে, তবে ও-সব খেলে গা-গতর বেশ শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে, গায়ের জোর বাড়ে, মনের জোরও বাড়ে। যে-সব ছেলে মারধর খায় না, তারা একটুতেই দেখবি কাহিল হয়ে পড়ে। তা ছাড়া মারধর খেলে ভয়ডরও চলে যায়। এতে তোর ভালই হচ্ছে।"

গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "পেটে খেলে পিঠে সয়—কথাটা তো জানো! আমার কপালে পেটে কিছু নেই, কিন্তু পিঠে আছে।"

গোবিন্দ জবাব দিল না, দর্পণে কী যেন ইশারা পেয়ে বনবাদাড় ভেঙে পশ্চিম দিকে ধেয়ে চলল। পিছু-পিছু গৌর। দন্তকলসের জঙ্গল, ভাটগাছ আর বিছুটিবন পেরিয়ে একটা ঢিবির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল গোবিন্দ। ঢিবির গায়ে একটা বড়সড় গর্ত। ছুঁচোর বাসাই হবে। সেই গর্তের সামনে দর্পণটা ধরে থেকে গোবিন্দ একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলে বলল, "হয়েছে।"

"কী হয়েছে গোবিন্দদা?"

"গর্তের মধ্যেই আছে। দৌড়ে গিয়ে একটা শাবল নিয়ে আয়।"

চোখের নিমেষে গৌর দৌড়ে গিয়ে শাবল আনল। গোবিন্দ গর্তটার মুখে শাবল ঢুকিয়ে চাড় দিতেই ঢিবির অনেকটা অংশ

ঝুরঝুরে হয়ে ভেঙে পড়ল। গোবিন্দ খানিক মাটি সরিয়ে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিতেই বাচ্চাসমেত তিনটে ধেড়ে ছুঁচো বেরিয়ে কিচিক-মিচিক শব্দ করে দিগ্‌বিদিক হারিয়ে ছুটে পালাল। গোবিন্দ বগল পর্যন্ত হাত ঢুকিয়ে খানিকক্ষণ হাতড়ে অবশেষে যখন হাত বের করে আনল, তখন তার হাতের মুঠোয় কবচ।

গৌরের চোখ আনন্দে চকচক করে উঠল। চেঁচিয়ে বলল, "এই তো আমার কবচ!"

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলল, "সে তো ঠিকই রে। অসাবধানে রেখেছিলি বলে ছুঁচোয় মুখে করে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু অত আনন্দ করার মতো কিছু হয়নি।"

"কেন গোবিন্দদা, তোমরাই তো বলো, এ-কবচের নাকি সাংঘাতিক গুণ!"

"সেটাও মিথ্যে নয়। তবে যোগেশ্বরবাবার দেওয়া ও কবচ হচ্ছে ঘুমন্ত। ঘুমের মধ্যে কি তুই কাজ করতে পারিস?"

"না তো!"

"তা হলে ও কবচটাও পারবে না। ওটাকে জাগাতে হবে।"

"কী করে জাগাতে হয়?"

"সে আমি কী জানি? আমার ছিল কবচ খুঁজে দেওয়ার কথা, দিয়েছি। এখন যার কবচ, সে বুঝবে।"

"কিন্তু না জাগলে আমি জাগাব কী করে?"

গোবিন্দ একটু হাসল। বলল, "সে ঠিকই জানতে পারবি। এখন কোমরে একটা কালো সুতোয় ভাল করে কবচটা বেঁধে রাখ। যেন না হারায়। সময় হলেই কবচকে ঘুম থেকে তোলা হবে। এখন কাজে যা। ঘাটে বাসন ফেলে এসেছিস, একখানা চুরি গেলে তোর বউদি আস্ত রাখবে না।"

গৌর তাড়াতাড়ি ঘাটে ফিরে গেল।

বিকেলবেলায় কবচটা খুব সাবধানে কোমরে বেঁধে নিল গৌর। তারপর গোরুর জাবনা দিয়ে, গোয়ালে সাঁজাল দিয়ে কাজ সেরে ফেলতে গেল।

হাডুডু সে খুবই ভাল খেলে। অফুরন্ত দম, একদমে তিন-চারজনকে মেরে দিয়ে আসে। যাকে জাপটে ধরে, সে আর নিজেকে ছাড়াতে পারে না।

গৌরের দল রোজই জেতে। আজও তারা তিন পার্টিই জিতল। কিন্তু জিতেও গৌরের সুখ নেই, বরং উলটে তার ভয় হল। বেশি খেলাধুলো করলে খিদেটাও যে বেশি পায়। রাতের খাওয়া বন্ধ, খিদে পেলে পেটের জ্বালা জল ছাড়া আর কিছু দিয়ে তো মেটানো যাবে না। গোবিন্দদা যদি আজ না আসে বা এলেও যদি রুটি আনতে ভুলে যায়, তা হলে কী হবে?

খেলার পর মাঠের ধারে বসে রোজই গৌর বন্ধুদের সঙ্গে একটু গল্পগাছা করে। আজও করল। তারপর বাড়ি যাবে বলে সবাই যে যার পথ ধরল।

বাজারের কাছ দিয়ে আসার সময় তেলেভাজার ম' ম' গন্ধে গৌর দাঁড়িয়ে গেল। বলতে নেই, তার খিদে পেয়েছে। তেলেভাজার গন্ধে সেই খিদেটা এখন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। হরিপদ আজ হিং দিয়ে আলুর চপ আর ফুলুরি ভাজছে। কী যে বাস ছেড়েছে, সে আর বলার নয়। ইচ্ছে করে, লাফিয়ে পড়ে থাবিয়ে সব খেয়ে নেয়।

কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো হল না। আইনকানুন আছে, সহবত আছে, চক্ষুলজ্জা আছে। গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হরিপদর দোকানটা এড়িয়ে বটতলার ঘুরপথটা ধরল। এ-পথটা অন্ধকার, নির্জন। তা হোক, তবু ফুলুরির দোকানের সামনে দিয়ে না যাওয়াই ভাল। তার লোভী চোখের নজর লাগলে ও ফুলুরি আর তেলেভাজা যে খাবে, তারই পেটের অসুখ করবে।

বটতলার মহাবীরের থান পেরোলেই আমবাগান। সেখানে জমাট অন্ধকারে থোকা থোকা জোনাকি জ্বলছে। ঝিঁঝি ডাকছে খুব। সামনেই সরকারদের পোড়ো বাড়ি, যেখানে কন্ধকাটা ভূত আছে বলে সবাই জানে। সন্ধের পর এ-পথে কেউ বড় একটা হাঁটাচলা করে না। গৌর যে খুব সাহসী এমন নয়, তবে গরিবদুঃখীদের ভয়ডর বেশি থাকলে চলে না। সে এগোতে লাগল। গুনগুন করে একটু গান ভাঁজছিল সে, ভয় তাড়ানোর জন্য। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "কে রে?"

তার স্পষ্ট মনে হয়েছে, অন্ধকারে আগে আগে কে যেন হাঁটছে। এখনও চাঁদ ওঠেনি। অমাবস্যা চলছে। কিন্তু আকাশ থেকে যে ঝাপসামতো একটুখানি আভা-আভা আলো আসে, তাইতেই তার মনে হয়েছে, একটা সরু লোক, স্পষ্ট বোঝা যায়নি অবশ্য। কিন্তু লোকটা জবাব দিল না।

গৌর আবার হাঁটতে লাগল। আমবাগানের সুঁড়িপথে ঢুকতে যাবে, এমন সময় আবার মনে হল, সামনেই কেউ একটা আছে। পায়ের শব্দ হল যেন।

"কে ওখানে?"

কেউ জবাব দিল না। কিন্তু হঠাৎ ঠন করে কী একটা জিনিস যেন এসে পড়ল গৌরের পায়ের কাছে। সে প্রথমটায় চমকে উঠেছিল। তারপরে সাহস করে নিচু হয়ে মাটি হাতড়ে গোলমতো একটা জিনিস পেয়ে তুলে নিল। জিনিসটার ওপর হাত বুলিয়ে আন্দাজে বুঝল, একটা কাঁচা টাকা।

ভয়ে গৌর আর এগোতে পারল না। টাকাটা মুঠোয় নিয়ে পিছু হটে আবার বাজারে চলে এল। দোকানের আলোয় মুঠো খুলে দেখল, টাকাই বটে। কিন্তু টাকাটা তার দিকে ছুড়ে দিল কে? আর দিলই বা কেন? অনেকক্ষণ ভেবেও সে প্রশ্নের জবাব পেল না। তবে

মনে হল, টাকাটা যখন পাওয়াই গেছে, তখন খরচ করতে দোষ নেই। যে-ই দিয়ে থাক, সে গৌরের খিদের কথা জানে।

হরিপদর দোকানে গিয়ে গরম-গরম ফুলুরি আর আলুর চপ খেল গৌর। শ্রীদাম ময়রার দোকান থেকে রসগোল্লাও খেল। টাকাটা কে দিল তা ভাবতে ভাবতে একটু অস্বস্তি নিয়েই বাড়ি ফিরল গৌর। নিতাইগোপাল তার দুই শালাকে নিয়ে খেয়ে উঠে আঁচাচ্ছে। তার দিকে চেয়ে গম্ভীর মুখে বলল, "তৈরি হ'। রাতে পাহারা দিতে হবে মনে থাকে যেন।"

গৌর মাথা নেড়ে নিজের ঘরে গিয়ে লাঠিগাছা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল।

ক্রমে রাত নিশুতি হয়ে এল। সবাই অঘোর ঘুমে। গৌর একা দাওয়ায় বসে লাঠি ঠুকে ঠুকে পাহারা দেওয়ার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে উঠে চারদিকটা ঘুরেও আসছে। হুয়া-হুয়া করে একঝাঁক শেয়াল ডেকে উঠল কাছেই, দীর্ঘ বিষণ্ণ সুরে একটা কুকুর কাঁদতে লাগল। রাতের আরও সব বিচিত্র শব্দ আছে। কখনও তক্ষক ডাকে, কখনও প্যাঁচা, কখনও বাঁশবনে হাওয়া লেগে মচমচ শব্দ ওঠে, কখনও গুপুস করে পুকুরে ঘাই মারে বড় বড় মাছ। ঝিঁঝি ডাকে, কোনও বাড়ির খোকা হঠাৎ ওঁয়া-ওঁয়া করে কেঁদে ওঠে। শব্দগুলি সবই গৌরের চেনা। তবু আজ তার একটু গা-ছমছম করতে লাগল। তাকে ঘিরে যেন ক্রমে-ক্রমে একটা রহস্যের জাল বোনা হচ্ছে। কে বুনছে? কে সেই অদ্ভুত মাকড়সা?

একটু ঢুলুনি এসেছিল গৌরের। হঠাৎ দূর থেকে একটা খটখট শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল। চটকা ভেঙে সোজা হয়ে বসল গৌর। ঘোড়ার পায়ের শব্দ না? জোর কদমে নয়, আস্তে আস্তে একটা ঘোড়া হেঁটে আসছে এদিকপানে।

গৌর ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে কপাটের আড়ালে গা-ঢাকা

দিল। উঁকি মেরে দেখল, উঠোনে একটা মস্ত সাদা ঘোড়া ধীর পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়াল, পিঠে সেই লম্বা লোকটা। লোকটা এতই লম্বা যে, ঘোড়ার পিঠ থেকেও তার পা দুটো মাটি ছুঁই-ছুঁই। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে লোকটা সোজা গিয়ে মাউ আর খাউয়ের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল কপাট। লোকটা ভিতরে ঢুকতেই দরজা ফের বন্ধ হয়ে গেল।

গৌরের বুকটা ভয়ে টিপটিপ করছে। এই লম্বা লোকটাকে দেখলেই তার মনটা ভয়ে কুঁকড়ে যায়। মনে হয় এ-লোকটা মোটেই ভাল নয়। আগের দিন ঘোড়াটা দেখতে পায়নি গৌর। আজ দেখল। গ্রামদেশে এ-রকম বিশাল চেহারার ঘোড়া দেখাই যায় না। খুবই ভাল জাতের তেজী ঘোড়া। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই, লেজটা পর্যন্ত তেমন নাড়াচ্ছে না।

কৌতূহল বড় সাংঘাতিক জিনিস। লম্বা লোকটা যে ভাল নয়, তা বুঝেও এবং মাউ আর খাউয়ের হুমকি সত্ত্বেও, গৌরের ইচ্ছে হল, লোকটা কী করতে এত রাতে আসে, সেটা একটু দেখতে। খুব ভয় করছিল গৌরের, তবু সে পা টিপে টিপে গিয়ে মাউ আর খাউয়ের ঘরের পিছন দিকের একটা জানালার ভাঙা খড়খড়ি দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল।

ঘরে মিটমিটে হ্যারিকেনের আলোয় লম্বা লোকটার মুখখানা দেখে বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করে ওঠে গৌরের। এ যেন কোনও জ্যান্ত মানুষের মুখই নয়। বাসি মড়ার মুখে যেমন একটা রক্তশূন্য হলদেটে ফ্যাকাশে ভাব থাকে, এর মুখখানাও সে-রকম। চোখ দুটো গর্তের মধ্যে ঢোকানো, নাকটা লম্বা হয়ে বেঁকে ঝুলে পড়েছে ঠোঁটের ওপর। একটা কাঠের চেয়ারে বসে কোলের ওপর দুই হাত জড়ো করে লোকটা স্থির দৃষ্টিতে মাউ আর খাউয়ের দিকে চেয়ে ছিল। মাউ আর খাউয়ের ভাবগতিক দেখে খুবই অবাক হল গৌর।

গুন্ডা ও দুর্দান্ত প্রকৃতির দুই ভাই এখন জড়সড় হয়ে লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখ অবশ্য দেখতে পেল না গৌর, কারণ গৌরের দিকেই তাদের পিঠ। তবে হাবভাবে বুঝতে পারল লম্বা লোকটাকে এরা দারুণ ডরায়।

লম্বা লোকটা স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ দুই ভাইকে দেখল, তারপর মৃদুস্বরে বলল, "খুন করতে প্রথমটায় হাত কাঁপে বটে, কিন্তু আস্তে-আস্তে অভ্যেস হয়ে যায়। মশামাছি মারা যেমন খুন, মানুষ মারাও তা-ই। ভয় পেয়ো না। আমার দলে থাকতে গেলে এ-সব করতেই হবে।"

মাউ ভয়-খাওয়া গলায় বলে, "যদি পুলিশে ধরে?"

লম্বা লোকটা মৃদু একটু হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "পুলিশ কিছু করতে পারবে না। সে ব্যবস্থা আমি করব। আমার রাজ্য উদ্ধার হয়ে গেলে তোমাদের এত বড়লোক বানিয়ে দেব যে, এখন তা কল্পনাও করতে পারবে না। বড়লোক হতে গেলে একটু কষ্ট তো স্বীকার করতেই হবে।"

মাউ গলা-খাঁকারি দিয়ে বলল, "কাকে খুন করতে হবে তা যদি বলেন।"

"সময়মতো জানতে পারবে। কিন্তু তার আগে আর-একটা কাজ আছে। আমি আমাদের পুরনো প্রাসাদের নকশা থেকে জানতে পেরেছি যে, এই বাড়িটা একসময়ে আমাদের তোশাখানা ছিল। আমার বিশ্বাস, এ-বাড়ির তলায় এখনও আমার পূর্বপুরুষের ধনসম্পদ রয়ে গেছে। কাজেই নিতাই আর গৌরকে খুব তাড়াতাড়ি এ-বাড়ি থেকে তাড়াতে হবে।"

মাউ আর খাউ পরস্পরের দিকে একটু তাকাতাকি করল। তারপর মাউ বলল, "তা হলে ওরা যাবে কোথায়?"

লম্বা লোকটা মৃদু হাসল। তারপর বলল, "নিতাইকে নদীর ধারে

একটা ছোট ঘর করে দেওয়া যাবে। আর গৌর ছেলেটা একেবারেই ফালতু। এটাকে টিকিয়ে রাখার কোনও মানেই হয় না। তোমরা কী বলো?"

মাউ আর খাউ ফের নিজেদের মধ্যে তাকাতাকি করে নেয়। তারপর মাউ বলে, "সে অবশ্য ঠিক রাজামশাই।"

গৌরের হাত-পা এ-কথা শুনে একদম হিম হয়ে গেল।

রাজামশাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, "ওকে একবার তোমরা ডুবিয়ে প্রায় মেরে ফেলেছিলে, তাই না? ছোঁড়াটা অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিল। এবার ওকে দিয়েই তোমাদের বউনি হোক। কিন্তু সাবধান, বোকার মতো কোনও কাজ কোরো না। এমনভাবে কাজ হাসিল করবে, যাতে কেউ তোমাদের সন্দেহ করতে না পারে।"

"যে আজ্ঞে।"

রাজামশাইয়ের পরনে আলখাল্লার মতো লম্বা সাদা পোশাক। তাতে জরির চুমকি। পকেটে হাত ভরে রাজামশাই একটা চকচকে জিনিস বের করে মাউ আর খাউয়ের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, "এটা রাখো।"

রাজামশাই দরজা খুলে বেরোতেই গৌর চুপিসারে সরে গিয়ে আমবাগানের মধ্যে সেঁধোল। ভয়ে তার বুক ঢিপঢিপ করছে, হাত-পা ঝিমঝিম করছে, বুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে। সে একটা গাছের গোড়ায় ধপ করে বসে দম নিতে লাগল।

রাজামশাইয়ের ঘোড়ার পায়ের শব্দ ধীরে-ধীরে দূরে মিলিয়ে যেতে একটু নড়েচড়ে বসল গৌর। তার মনে হল, বাঁচতে হলে আর বেশি দেরি করা চলবে না। এক্ষুনি পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে রওনা হয়ে পড়তে হবে।

পা টিপে টিপে চারদিকে চোখ রাখতে রাখতে গৌর নিজের ঘরে এসে কপাটটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল। জামাকাপড় তার খুবই

সামান্য। জিনিসপত্তরও তেমন কিছু নেই। একজোড়া মোটা কাপড়ের ধুতি আর দুটো গেঞ্জি গামছায় বেঁধে লাঠিগাছা হাতে নিয়ে সে যখন বেরোতে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ পিছন থেকে সরু গলায় কে যেন বলে উঠল, "গৌর কি ভয় পেলে?"

গৌর চমকে উঠে, সভয়ে জানালাটার দিকে তাকাল। জানালার ও-পাশে অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

কাঁপা গলায় গৌর বলে, "কে...কে ওখানে?"

"পালিয়ে কি বাঁচতে পারবে গৌর? যেখানেই যাও, রাজা রাঘবের গুপ্তঘাতকদের হাত থেকে রেহাই পাবে না।"

"আপনি কে?"

"আমি তোমার একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। এখন যা বলছি, শোনো। রাজা রাঘবের ক্ষমতা অনেক। তার মতো নৃশংস মানুষও হয় না। এই জায়গায় একসময়ে তার পূর্বপুরুষেরা রাজত্ব করত। অনেক দিন আগেই সেই রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। রাঘব আবার সেই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আমরা কিছু লোক সেটা ঠেকাতে চাইছি। কেন জানো?"

লোকটা যে-ই হোক, এর কথাবার্তা শুনে গৌরের মনে হল, লোকটা শত্রু নয়। সে একটু ভরসা পেয়ে বলল, "আজ্ঞে না। বলুন।"

"রাঘবের পূর্বপুরুষেরা ছিল সাংঘাতিক অত্যাচারী। কেউ সামান্য বেয়াদবি করলেই তার গলা কেটে ফেলে দিত। আসলে ওরা রাজত্ব তৈরি করেছিল ডাকাতি করে। রাজা হয়েও সেই ডাকাতির ভাবটা যায়নি। প্রায় একশো পঁচিশ বছর আগে একদল প্রজা খেপে গিয়ে মরিয়া হয়ে প্রাসাদ আক্রমণ করে। প্রাণভয়ে রাজা আর তার আত্মীয়রা পালায়। বিদ্রোহী প্রজার হাতে কয়েকজন মারাও পড়ে। তখন যে রাজা ছিল তার নাম মাধব। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, এই বেয়াদবির শোধ সে নেবেই। সে না পারলেও তার বংশের

কেউ-না-কেউ ফিরে এসে এখানে আবার রক্তগঙ্গা বইয়ে রাজ্য স্থাপন করবে।"

গৌর জানালার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওই লম্বা লোকটাই কি রাঘব?"

"হ্যাঁ। সাংঘাতিক লোক। রাঘব না-পারে এমন কোনও কাজ নেই। ওর চেহারাটা রোগা বটে, কিন্তু লোহার মতো শক্ত। যে-কোনও বড় পালোয়ানকে ও পিষে মেরে ফেলতে পারে। আর শুধু গায়ের জোরই নয়, ওর কিছু অদ্ভুত ক্ষমতাও আছে। ও চোখের দৃষ্টি দিয়ে যে-কোনও মানুষকে একদম অবশ করে দিতে পারে। নানারকম দ্রব্যগুণও ওর জানা আছে। ওর টাকাপয়সাও অনেক। যেখানে যত ভয়ংকর, নিষ্ঠুর, পাজি আর বদমাশ আছে, তাদের ও একে-একে জোগাড় করছে। সেই সব লোককে নিয়ে একটা দল তৈরি করে একদিন ঝাঁপিয়ে পড়বে এই গ্রাম আর আশপাশের পাঁচ-সাতখানা গাঁয়ের ওপর। গাঁয়ের পর গাঁ জ্বালিয়ে দেবে, বহু মানুষকে কচুকাটা করবে। তারপর নিজের দল নিয়ে রাজত্ব করবে। বুঝেছ?"

গৌর কাঁপতে কাঁপতে বলল, "বুঝেছি। কিন্তু আমাকে যে মারবার হুকুম দিয়ে গেল, আমি এখন কী করি?"

"ভয় পেয়ো না। পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। একটু সতর্ক থেকো, তা হলেই হবে। আর তোমার কবচটাকে ঠিকমতো ব্যবহার কোরো।"

কবচ! কবচের কথা গৌর ভুলেই গিয়েছিল। কোমরে হাত বুলিয়ে কবচটা ছুঁয়ে দেখে সে বলল, "কিন্তু গোবিন্দদা বলছিল, কবচটা নাকি ঘুমন্ত। এটাকে না জাগালে কাজ হবে না।"

"গোবিন্দ ঠিকই বলেছে।"

"তা কবচটাকে জাগাব কী করে?"

"সে ঠিক সময়মতো জানতে পারবে।"

"এখন আমি কী করব তা হলে?"

"যেমন আছ তেমনি থাকবে। চারদিকে চোখ রেখে চলবে।"

"আপনি কে?"

"আমি রাজা রাঘবের শত্রু, এর বেশি আজ আর বলব না।"

"আমবাগানে কে একজন আমার দিকে একটা টাকা ছুড়ে দিয়েছিল, সে কি আপনি?"

কেউ এ-কথার জবাব দিল না। গৌর চেয়ে দেখল, জানালার ধারে ছায়ামূর্তিটা নেই।

গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পুঁটুলি খুলে ধুতি আর গেঞ্জি যথাস্থানে রেখে দিল।

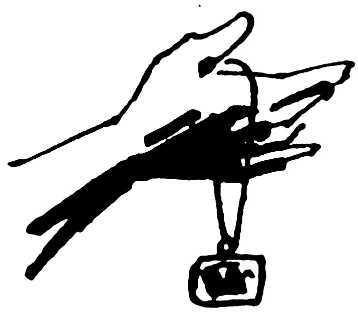

পরদিন সকালেই একটা ছেলে এসে গৌরকে খবর দিল, বিকেলে ন'পাড়ার সঙ্গে দারুণ হাডুডু ম্যাচ। এ-রকম কোনও ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু ন'পাড়ার কোন বড়লোক নাকি এই হাডুডু ম্যাচের জন্য টাকা দিচ্ছেন। যে-দল জিতবে, তার প্রত্যেক খেলোয়াড় একটা করে সোনার মেডেল আর নগদ পঞ্চাশ টাকা পাবে। তা ছাড়া খেলার শেষে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হয়েছে।

খবরটা পেয়ে গৌরের ভারী আনন্দ হল। সোনার মেডেল, টাকা, এ-সব তার কাছে স্বপ্নের মতো। হাডুডু সে ভালই খেলে। তার দম অফুরন্ত, গায়ে জোরও সাংঘাতিক। চটপটেও সে বড় কম নয়। গাঁয়ের দলের সে-ই সবচেয়ে ভাল খেলোয়াড়।

সারাদিনটা মেডেল আর টাকার কথা চিন্তা করে মনটা বেশ

উড়ু-উড়ু হয়ে যাচ্ছিল তার। আবার মাঝে মাঝে কেমন যেন একটা আবছা ভয়ও হচ্ছিল। ন'পাড়া তাদের পাশের গ্রাম। বেশি দূর নয়। তবে ন'পাড়ার সঙ্গে তারা কখনও খেলেনি। গ্রামটার খুব বদনাম আছে ডাকাতের গাঁ বলে। ন'পাড়ার নামে লোকে ভয়ে কাঁপে। লটকা, কচি বেত বা কামরাঙার খোঁজে বন্ধুদের সঙ্গে কয়েকবার ন'পাড়া গেছে গৌর। গাছপালায় ঘেরা অন্ধকার গা-ছমছমে পরিবেশ। একটা হাজার বছরের পুরনো কালীবাড়ি আছে। সেখানে এখনও রোজ পুজো হয়। ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতরা নাকি এই কালীকেই পুজো দিয়ে ডাকাতি করতে বেরোয়। ন'পাড়ার মানুষগুলোও কিছু অদ্ভুত। প্রত্যেকেরই বেশ মজবুত চেহারা আর প্রত্যেকেই ভীষণ গোমড়ামুখো । দেখলেই ভয় করে। ন'পাড়ার ছেলেরা যে হাডুডু খেলে, এটা গৌর জানতই না, তাই কেমন একটু অস্বস্তি হচ্ছিল তার।

বিকেলে একটু তাড়াতাড়ি ফিরে গোরুর জাবনা দিয়ে, ঘরদোরের কাজ চটপট সেরে গৌর গিয়ে দক্ষিণের মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে জুটে ন'পাড়া রওনা হল।

তেজেন হল দলের ক্যাপটেন। গৌর তাকে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে তেজেন, ন'পাড়ার আবার কবে থেকে খেলাধুলোর শখ হল?"

তেজেন বলল, "কী জানি ভাই, ন'পাড়ার ছেলেরা যে খেলে তা-ই তো জানতাম না। তবে শুনেছি, এক বড়লোক জুটেছে সেখানে। যে নাকি গাঁয়ের চেহারা বদলে দেবে, জলের মতো টাকা ঢালছে।"

"সোনার মেডেল দেবে সত্যি?"

"সোনার মেডেল, টাকা, তার ওপর পোলাও-কালিয়া দিয়ে ভোজ।"

"এর মধ্যে কোনও গোলমাল নেই তো?"

"গোলমাল আর কী থাকবে? বিশে নিজে আজ ন'পাড়ায় গিয়ে দেখে এসেছে সেখানে সাজো-সাজো রব, রঙিন কাগজ দিয়ে সারা গাঁ সাজানো হয়েছে। কালীবাড়ির সামনের চাতালে বিশাল উনুন তৈরি হচ্ছে, বত্রিশটা পাঁঠাবলি হয়ে গেছে, হাঁড়ি-হাঁড়ি দই-মিষ্টি আসছে ঘোষপাড়া থেকে।"

দলের সকলেরই ভারী ফুর্তি, জোর কদমে হাসাহাসি আর গল্পসল্প করতে করতে হাঁটছে সবাই।

গৌর হঠাৎ তেজেনকে জিজ্ঞেস করল, "আর হেরে গেলে কী দেবে?"

তেজেন বলল, "সে-কথাও হয়েছে. হারলে পাঁচ টাকা করে পাবে সবাই। খাওয়া তো থাকছেই। তবে ভাবছিস কেন, আশপাশের দশখানা গাঁয়ে আমরাই সেরা। ন'পাড়ার ছেলেদের গায়ে যত জোরই থাকুক, আমাদের মতো কায়দা জানে না। হেরে ভূত হয়ে যাবে।"

কিন্তু গৌর তেজেনের মতো নিশ্চিন্ত হল না। তার মনে কেমন একটা অস্বস্তি হতে লাগল। এই যে হুট করে খেলার আয়োজন, এত প্রাইজ আর মেডেলের লোভানি, এটাকে খুব স্বাভাবিক ঘটনা বলে ভাবতে পারছে না সে।

ন'পাড়ায় ঢুকে তার অস্বস্তিটা বরং বাড়ল। বাস্তবিকই এ-পাড়াকে আজ চেনা যায় না। গাছে গাছে রঙিন ফেস্টুন, রঙিন কাগজের শিকলি, নিশান, কালীবাড়িতে ব্যান্ড পার্টিও এসেছে, দারুণ বাজনা বাজছে সেখানে।

কালীবাড়ির পাশেই খেলার মাঠে কোর্ট কাটা হয়েছে। লোকে লোকারণ্য, গৌররা সেখানে যেতেই একদল বাচ্চা মেয়ে এসে সবাইকে মালা পরিয়ে দিল, কপালে দিল চন্দনের ফোঁটা, এই সব দেখে সকলেই কেমন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

কোর্টের পাশেই সুন্দর করে সাজানো টেবিলে ছোট ছোট নীল

ভেলভেটের বাক্সে সোনার মেডেলগুলো ঝকঝক করছে। টেবিলের ও-ধারে চারটে চেয়ারে চারজন বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারার মানুষ বসে আছেন।

গৌররা ঢুকতেই সকলে হাততালি দিয়ে হর্ষধ্বনি করে উঠল।

তেজেন গৌরের কানে-কানে বলল, "আজ জিততেই হবে গৌর।"

"চেষ্টা করব।"

"জিতে না ফিরলে প্রেস্টিজ থাকবে না, মনে রাখিস।"

খেলা শুরু হতে একটু দেরি আছে; দু'পক্ষের টিম এসে মাঠের ধারে জড়ো হয়েছে সবে। একটা দৃশ্য দেখে সকলে অবাক। ন'পাড়ার খেলোয়াড়দের মধ্যে মাউ আর খাউ রয়েছে।

তেজেন ন'পাড়ার ক্যাপটেনের কাছে গিয়ে আপত্তি জানাল, "ওরা তো আমাদের গাঁয়ে থাকে, ওরা তোমাদের হয়ে খেলছে কেন?"

ন'পাড়ার ক্যাপটেন বলল, "মোটেই তোমাদের গাঁয়ের লোক নয় ওরা, কুটুমবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে এই মাত্র। তোমরা ওদের টিমেও নাওনি, তাই আমরা হায়ার করেছি।"

তেজেন আর যুক্তি খুঁজে না পেয়ে ফিরে এসে গৌরকে চুপিচুপি বলল, "তোর কুটুমরা ও-দলে খেলছে, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে।"

"তা-ই দেখছি।"

গৌরের বুকের ভিতরটা একটু ঢিপঢিপ করতে লাগল। মাউ আর খাউ ন'পাড়ার হয়ে খেলছে খেলুক, সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু রাঘবরাজা ওদের যে হুকুমটা দিয়েছে, সেটা মনে করেই গৌরের হাত-পা হিম হয়ে আসছিল। তার মনে হচ্ছিল, খেলায় না নেমে ফিরে গেলেই বোধহয় ভাল হত। মাউ আর খাউয়ের মতলব হয়তো ভাল নয়।

কিন্তু পিছিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। মালা পরে চন্দনের ফোঁটা নিয়ে পিছিয়ে গেলে সবাই দুয়ো দেবে। তাদের গাঁ থেকেও অনেকে খেলা দেখতে এসেছে, তারাই বা মনে করবে কী? ভিড়ের মধ্যে গৌর কবরেজমশাই, ফকিরসাহেব, গোবিন্দদা, সবাইকেই দেখতে পেল।

শরীরের আড় ভাঙার জন্য কোর্টে নামার আগে একটু ডনবৈঠক করে গা ঘামিয়ে নিচ্ছিল সবাই। এমন সময় কবরেজমশাই এগিয়ে এসে একটা ছোট্ট শিশি গৌরের হাতে দিয়ে বললেন, "চটপট তেলটুকু মেখে নে। হাতে-পায়ে আর ঘাড়ে ভাল করে মাখিস।"

"এ মেখে কী হবে কবরেজমশাই?"

"হবে আমার গুষ্টির পিণ্ডি, যা বলছি, চোখ বুজে করে যা। আজ তোর বড় ফাঁড়া।"

গৌর আর দ্বিরুক্তি না-করে তেলটা মেখে ফেলল। ভারী অদ্ভুত তেল। জলের মতো পাতলা, মাখতেই শরীরে মিশে গেল। কোনও তেলতেলে ভাব অবধি থাকল না।

খেলা শুরু হল। প্রথম দান গৌরদের। তেজেন দম নিয়ে 'ডু...উ...উ...উ...' ডাক ছেড়ে ঢুকে গেল ন'পাড়ার এলাকায়। দু'হাত পাখির ডানার মতো ছড়ানো, হালকা পায়ে উড়ে উড়ে কোর্টের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত যেতে যেতে হাত দিয়ে তীব্র কয়েকটা ছোবল ছুড়ল সে, চকিতে পা বাড়িয়ে দিল এদিক-সেদিক। না, ন'পাড়ার কেউ 'আউট' হল না।

তেজেন নিজের কোর্টে ফিরে আসতে না আসতেই ন'পাড়ার এক বিশাল চেহারার কালো জোয়ান পাহাড়ের মতো ধেয়ে এল। বিকট 'ডু...উ...উ...' শব্দ করতে করতে কোর্টে ঢুকে পড়তেই গৌর বুঝে গেল, লোকটা আনাড়ি। চেহারা বিশাল হলেই তো হয় না। এ-খেলায় চটপটে হওয়া এবং কূটকৌশল জানা একান্ত দরকার।

এ-লোকটার তা নেই, এক্ষুনি ধরা পড়ে যাবে। গৌর প্রস্তুত হল।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, লোকটা কাউকে আউট করার জন্য হাত-পা খেলানোর চেষ্টাই করল না। বিপক্ষের কোর্টে ঢুকে সে একটু থমকে দাঁড়িয়ে হঠাৎ প্রবল আক্রোশে আর প্রতিহিংসায় সোজা এগিয়ে এল গৌরের দিকে।

গৌর লোকটার কাণ্ড দেখে অবাক। তেজেন এবং তার দলবল চারদিক থেকে ঘিরে ধরে জাপটেও ফেলল লোকটাকে। কিন্তু দানবের মতো লোকটা দু' তিন ঝটকায় সবাইকে ঝেড়ে ফেলে জোড়পায়ে একটা তুর্কি লাফ মেরে লাফিয়ে পড়ল গৌরের ওপর।

ওই বিশাল দানবীয় চেহারার জোড়া লাথি বুকে লাগলে পাঁজরের হাড় মড়মড় করে ভেঙে যাওয়ার কথা। কিন্তু গৌর নিজে ভাল খেলোয়াড়, গায়ের জোরে দানবটার সঙ্গে পাল্লা টানতে না পারলেও সে দারুণ চটপটে, দ্রুতগতি। পা দুটো যখন তার বুকের ওপর নেমে আসছে, তখন সে খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। এ-খেলায় ছোঁয়াছুঁয়ি আছে বটে, কিন্তু ধরা পড়ার ভয় না-রেখে কেউ যে এ-রকম বেহেড হয়ে কারও ওপর লাফিয়ে পড়তে পারে, এ-ধারণা তার ছিল না। তাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে সে চট করে বাঁ দিকে শরীরটা বাঁকিয়ে পাঁকাল মাছের মতো সরে গেল। দানবটা তাকে পেরিয়ে গদাম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। গৌরই গিয়ে ধরে তুলল তাকে। অবাক হয়ে বলল, "এ কেমনধারা খেলা?"

লোকটা ভ্রূকুটি করে বলল, "এখনই কী? খেলা দেখবে।"

একটা লোক আউট হওয়ায় ন'পাড়ায় কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। পরের দান গৌরের, গৌর চোখ বুজে ঠাকুর স্মরণ করে বুকভরে দম নিল। তারপর ভিমরুলের মতো ডাক ছেড়ে হালকা পায়ে গিয়ে ঢুকল ন'পাড়ার কোর্টে। তেজেনের চেয়ে সে বহুগুণ

দ্রুতগতি, অনেক বেশি তার গায়ের জোর। সে অনেক উঁচুতে লাফাতে পারে, শরীরে নানারকম অদ্ভুত মোচড় দিতে পারে। এ-খেলায় সেইটিই দরকার। গৌর ঢুকেই চটপট ডাইনে-বাঁয়ে একটু বিদ্যুদ্‌তরঙ্গের মতো নিজেকে বইয়ে দিল। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল, ন'পাড়ার খেলোয়াড়গুলো আসলে খেলোয়াড় নয়, খুনে, কেন মনে হল কে জানে!

ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে আবার ডান দিকে ঘুরে যাওয়ার মুখেই এক পায়ের ওপর শরীরটাকে রেখে আর-এক পা চকিতে বাড়িয়ে লাইনে দাঁড়ানো একজন মুশকো চেহারার লোককে ছুঁয়ে দিল। আউট। গৌর চোখের পলকে বাতাসে শরীর ভাসিয়ে একটা লাফ মারল নিজের কোর্টের দিকে।

কিন্তু মাটিতে পড়তে পারল না গৌর, মুশকো লোকটা মোর হয়ে তখন মরিয়া। সেও এক লাফে এগিয়ে এসে গৌরের কোমরটা দু'হাতে জাপটে ধরে পেড়ে ফেলল মাটিতে। কিন্তু গৌর পাকা খেলোয়াড়। এই হুটোপাটিতেও দম হারায়নি। ডাক ছাড়তে ছাড়তেই সে লাইনের দিকে খানিকটা গড়িয়ে গেল লোকটাকে জাপটে ধরেই।

কিন্তু ন'পাড়ার খেলুড়েরা তখন ক'টা মস্ত মস্ত পাথরের মতো গদাম গদাম করে এসে তার ওপর পড়ছে। এ-খেলায় হুটোপাটি হয়ই। কিন্তু মারদাঙ্গার তো নিয়ম নেই। কিন্তু গৌর বুঝতে পারছিল, তাকে আউট করার ছল করে কে যেন লোহার হাতে তার গলার নলি টিপে ধরেছে। আর-একজন ঘুসি চালাচ্ছে কানের পিছনে। কে যেন হাঁটু দিয়ে তার বুকের পাঁজর ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কনুই দিয়ে কে যেন মারল তার পেটে। একটা লাথি এসে জমল তার মুখে।

অন্য কেউ হলে এতক্ষণে অজ্ঞান হয়ে যেত। কিন্তু গৌর অনেক

কষ্ট করে বড় হয়েছে। ব্যথাবেদনা তাকে কাবু করতে পারে না। শরীরটাও তার যথেষ্ট সহনশীল। তাই অতগুলো লোকের জাপটাজাপটি এবং আক্রমণের মধ্যেও সে দম ধরে রেখে ইঞ্চি-ইঞ্চি করে এগোতে লাগল লাইনের দিকে। যেন পাহাড় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে তার, মাথা ঝিমঝিম করছে। কিন্তু সে জানে, ন'পাড়ার এই লোকগুলো খেলোয়াড়ই নয়, এরা চায় তাকে খুন করতে। খেলায় হারজিত নিয়ে এরা মাথা ঘামায় না।

চারদিকে খুব চেঁচামেচি হচ্ছিল। গৌর লক্ষ করল, কে যেন তাকে আটকাতে না পেরে তার চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। হাতের অনামিকায় পলার আংটিটা দেখে চিনল গৌর। মাউ। মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল গৌর। বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু দম না ছেড়ে সে একবার শেষ চেষ্টায় শরীরে একটা ঢেউ দিল। সামান্য আলগা হল কি পিঠের ওপর পাহাড়টা? তবে গৌর দেখল, খুব চেষ্টা করলে তার আঙুল লাইনটা ছুঁয়ে ফেলতে পারে।

'ডু...উ...উ...' করে বুকের তলানি বাতাসটুকু উজাড় করে দিয়ে গৌর মাটির ওপর নিজেকে ঘষে দিয়ে এগোল। এগোতেই হবে। ডান হাতখানা আকুলভাবে বাড়িয়ে দিল লাইনের দিকে।

লাইনটা ছুঁল কি না বুঝতে পারল না গৌর, তবে একটা বিশাল চিৎকার উঠল চারদিকে। গৌরের চোখে সেই সময়ে নেমে এল নিবিড় অন্ধকার। সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

যখন জ্ঞান ফিরে এল, তখন তার সর্বাঙ্গ জলে ভেজা। কোর্টের ধারে তাকে শুইয়ে ক্ষতস্থানে ওষুধ মাখাচ্ছেন কবরেজমশাই। ক্ষত হয়েছেও বড় কম নয়। বুক আর হাতের অনেকটা ছাল উঠে গেছে। ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে, নাক ভেঙে গেছে, কানের পিছনে মাথাটা ফুলে ঢোল, কপালের অনেকটা ছড়ে গেছে। চারদিকে ভিড়ে ভিড়াক্কার।

গৌর প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, "আমার দানটার কী হল?"

কে একজন চেঁচিয়ে বলল, "ওঃ, যা দেখালে খেলা একখানা বাপ! এক দানে ন'পাড়ার গোটা দল আউট!"

শুনেই গৌরের রক্ত গরম হয়ে গেল। শরীরের ব্যথাবেদনা যেন উড়ে গেল ফুৎকারে। সে একলাফে উঠে পড়ে বলল, "আমি পরের গেম খেলব।"

ন'পাড়া কী চায় তা গৌর বুঝে গেছে। সে বুঝে গেছে, রাজা রাঘবের আদেশে ন'পাড়ার সাত খুনি সব খেলুড়েকে ছেড়ে শুধু তার ওপরেই চড়াও হবে। এই খেলার লক্ষ্যই হল গৌর। কিন্তু গৌরের আর ভয় করছিল না।

তেজেন তার অবস্থা দেখে চিন্তিত মুখে বলল, "এ কি খেলা নাকি? এ তো খুনখারাপি! তোকে আর খেলতে হবে না, বসে যা। একটা গেম তো একাই জিতিয়ে দিয়েছিস, এখন বসে জিরো।"

গৌর মাথা নেড়ে বলল, "না, বসব না। আমার কিছু হয়নি।"

"পারবি তো?"

"খুব পারব।"

পরের গেম শুরু হল। ন'পাড়ার দলটা একটু মনমরা বটে, কিন্তু ওদের চোখ ধকধক করে জ্বলছে। আর সকলেরই দৃষ্টি প্রতিপক্ষের একজনের ওপর। সে হল গৌর। গৌর যে এই বাঁশডলা খাওয়ার পর এখনও দাঁড়িয়ে আছে এবং আবার খেলার জন্য তৈরি হচ্ছে, এটা যেন তাদের বিশ্বাসও হচ্ছিল না, তারা সইতেও পারছিল না। সবচেয়ে বেশি ছটফট করছিল মাউ আর খাউ। পারলে তারা যেন ছিঁড়ে খায় গৌরকে।

খেলা শুরু হল। প্রথম ন'পাড়ার দান। যে দানবটা প্রথম দান দিতে এসে গৌরকে জোড়পায়ে লাথি মারার চেষ্টা করেছিল এবারও সে-ই আসছে। 'ডু...উ...উ...' বলে ডাক ছেড়ে সে লাফিয়ে এল গৌরদের কোর্টে। তবে এবার আর গৌরকে লাথি মারার মতো

বোকামি করল না। খেলার ভান করে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগল। গৌর স্থির দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখছিল। মাউ আর খাউয়ের সঙ্গে লোকটার চেহারার বেশ মিল আছে। তবে এ আরও বেশি লম্বাচওড়া এবং আরও বেশি নিষ্ঠুর প্রকৃতির।

লোকটা কাউকে 'মোর' করতে না পেরে ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ গৌর লাইন ছেড়ে এগিয়ে এল। বিদ্যুদ্‌গতিতে গিয়ে লোকটা লাইন পার হওয়ার আগেই দু'হাতে লোকটার কোমর ধরে ফেলল। গৌরের দলের সকলেই 'হায় হায়' করে উঠল। এ অবস্থায় লোকটাকে ধরে রাখা অসম্ভব। গৌর আউট হবেই, কারণ লোকটা গৌরের চেয়ে চেহারায় দেড়গুণ এবং লাইনে প্রায় পৌঁছেও গেছে।

কিন্তু গৌর অবিচল। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে আচমকা একটা হ্যাঁচকা টানে লোকটাকে প্রায় লাইনের ওপর থেকে টেনে আনল। গৌরের এই দুঃসাহসে লোকটা অবাক। তবে মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে সেও এক ঝটকা মারল। সেই ঝটকায় হাতি অবধি ছিটকে যায়।

কিন্তু গৌরের আজ হল কী কে জানে। সে সেই বিকট ঝটকায় একচুলও টলল না। একটা 'কোঁত' শব্দ করে সে লোকটাকে দু'হাতে শূন্যে তুলে নিল, তারপর কয়েকটা পাক দিয়ে নিজের কোর্টে মারল এক আছাড়। সেই আছাড়ে মাটি কেঁপে উঠল। চারদিকে এক সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা। কেউ যেন ঘটনাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপরেই বিপুল উল্লাসে দর্শকরা ফেটে পড়ল।

তেজেন এসে গৌরের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "তুই আমাদের সেরা খেলোয়াড় বটে, কিন্তু এ-রকম খেলা আগে কখনওই তো দেখিনি তোর! হল কী রে গৌর?"

গৌর গম্ভীরভাবে বলল, "আমিও তা জানি না। তবে এবার আমি দান দেব।"

তেজেন একটু দোনোমনো করে বলল, “দে তা হলে। আজ তোর কপালটা ভালই যাচ্ছে।”

কপাল নয়, অন্য কিছু। কিন্তু সেটা যে কী, তা গৌর বুঝতে পারছে না। হঠাৎ যেন শরীরে একশো হাতির জোর জোয়ারের মতো নেমে এসেছে। ঘোড়ার মতো টগবগ করছে হাত-পা। রক্ত গরম। শরীর পালকের মতো হালকা।

সে যখন হানা দিতে ন'পাড়ার কোর্টে ঢুকল তখন তার শরীরে ঘূর্ণিঝড়ের মতো গতি। শব্দ করে দম ছাড়তে ছাড়তে সে একেবারে বিপক্ষ দলের মধ্যে ঢুকে গেল। ন'পাড়ার মুশকো-মুশকো খেলোয়াড়রা তার কাণ্ড দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সকলে একেবারে শেষপ্রান্তে সরে গিয়ে অপেক্ষা করছে।

ডান কোণে দাঁড়িয়ে ছিল মাউ। চোখে উপোসি বাঘের মতো তীব্র দৃষ্টি। হঠাৎ যেন ভোজবাজির মতো মাউয়ের হাতে একটা গজাল এসে গেল কোথা থেকে। এমন কৌশলে সেটা হাতের পাতায় ঢেকে রেখেছে মাউ যে, কারও চোখে পড়ার কথা নয়। কিন্তু গৌর ঠিকই দেখতে পেল।

বাঁ দিকে একটু ঢেউ খেয়ে গৌর সোজা মাউয়ের দিকেই এগিয়ে গেল। পা বাড়িয়ে একটা ভড়কি দিয়েই সরে এল। ফের ডান দিকে ঝুল খেল। সবাই ভাবছে এবার সে ডান দিকে সরে যাবে। কিন্তু গৌর আবার বাঁ দিকে বিদ্যুদ্‌গতিতে এগিয়ে গিয়ে মাউকে বাঁ হাতে মোর করে দিল। কিন্তু মোর হয়েই মাউ লাফিয়ে পড়ল তার ওপর। হাতে লুকোনো গজাল।

গৌর শুধু হাতটা নজরে রেখেছিল। গজালসুদ্ধু হাতটা সোজা এগিয়ে এসেছিল তার পেটের দিকে। গৌর শরীরটা সরিয়ে নিয়ে হাতটা ধরে ফেলল, ঠিক যেমনভাবে নিপুণ সাপুড়ে বুনো সাপ ধরে। সঙ্গে সঙ্গে একটা মোচড়।

পাটকাঠির মতো মাউয়ের হাতটা যে ভেঙে যাবে, তা গৌর স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। মাউয়ের চেহারা বিশাল, গায়ে দানবের মতো জোর। এই সেদিনও গৌরকে মনের সুখে মেরেছে। গজালটা পড়ে গেল হাত থেকে। বাঁ হাতে ডান হাতটা চেপে ধরে 'বাপ রে' বলে চেঁচিয়ে বসে পড়ল মাউ। চারদিকে একটা হইহই উঠল। "গজাল! গজাল! ...এ তো খুনখারাপির মতলবে ছিল! বের করে দাও! ন'পাড়া হেরে গেছে। ...দুয়ো... দুয়ো..."

কিন্তু লোকে চেঁচালে হবে কী? ন'পাড়ার উদ্দেশ্য তো খেলা নয়! মাউ পড়ে যেতেই ন'পাড়ার বাকি ছ'জন আবার লাফিয়ে পড়ল গৌরের ওপর।

গৌর পড়ে গেল না, ঘাবড়াল না। সাবধানে দমটা ধরে রেখে সে শরীরে একটা ঘূর্ণি তুলল আবার। চরকির মতো বোঁ বোঁ করে ঘুরপাক খেতে লাগল সে। আর ঘূর্ণাবেগে ন'পাড়ার বিশালদেহী খেলোয়াড়রা ছিটকে ছিটকে যেতে লাগল এদিক-সেদিক। দু'জন গিয়ে পড়ল কোর্টের বাইরে, একজন দর্শকদের মধ্যে।

গৌর সবাইকে আউট করে নিজের কোর্টে ফিরে আসতেই এমন তুমুল হাততালি আর হর্ষধ্বনি উঠল যে, কানে তালা ধরার উপক্রম।

দর্শকদের সেই উল্লাস ছাপিয়ে একটা রাজকীয় গুরুগম্ভীর গলা থেকে একটামাত্র শব্দ বেরিয়ে এল, "শাবাশ!"

গৌর তাকিয়ে হিম হয়ে গেল। যে-টেবিলে প্রাইজ রাখা আছে, তার ও-পাশে দাঁড়িয়ে রাজা রাঘব। প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, সাদা একটা জোব্বার মতো পোশাকে তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

গৌর সম্মোহিতের মতো রাজা রাঘবের দিকে চেয়ে ছিল।

হঠাৎ রেফারি ঘোষণা করল, "খেলা শেষ। পাঁচ পাট্টি খেলা বাতিল করা হল। মল্লারপুরকে বিজয়ী ঘোষণা করা হচ্ছে। বিজয়ী দলের গৌরগোপাল এ-খেলায় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান পেয়েছে।

তাকে এর জন্য অতিরিক্ত একশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।"

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মল্লারপুরের লোকেরা দারুণ নাচানাচি আর হইহই শুরু করে দিল। খেলোয়াড়দের কাঁধে তুলে কোর্টের চারপাশে ঘোরানো হল। গৌরকে নিয়েই হইচই হল সবচেয়ে বেশি। গোলমাল থামবার পর গৌর আর রাজা রাঘবকে কোথাও দেখতে পেল না, ন'পাড়ার গুন্ডা খেলোয়াড়রাও কে কোথায় সরে পড়েছে।

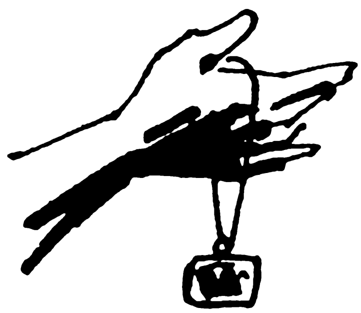

খাওয়াদাওয়া সেরে উঠতে বেশ রাত হয়ে গেল। আর খাওয়াটাই তো এক এলাহি ব্যাপার। পোলাও, মাছের কালিয়া, মাংসের কোর্মা, ছানার ডালনা, মুড়িঘন্ট, মাছের মুড়ো দিয়ে মুগডাল, চাটনি, রাবড়ি, রসগোল্লা, সরভাজা...উফ। সকলে খেতে খেতে একেবারে জেরবার হয়ে গেল। তবে গৌর মাছমাংস, পেঁয়াজ-রসুন খায় না। তার মা তাকে ছেলেবেলা থেকেই ও-সব খাওয়ায়নি! তাদের বংশটাই নিরামিষ বংশ। বহুকাল ধরে প্রথাটা চলে আসছে। কিন্তু নেতাইগোপাল তার বউয়ের পাল্লায় পড়ে ও-সব আর মানে না। গৌর মানে। মা বারণ করে গেছে বলেই মানে। সে ছানার ডালনা দিয়ে পোলাও খেল, আর প্রায় এক হাঁড়ি রাবড়ি।

খেয়ে উঠে সবাই মিলে গলায় মেডেল আর মালা ঝুলিয়ে, ট্যাঁকে প্রাইজের টাকা গুঁজে রওনা হল। মল্লারপুরের লোকেরা যারা খেলা দেখতে এসেছিল, তারা সবাই আগেই ফিরে গেছে। এখন তারা শুধু আট-দশজন।

রাস্তা অন্ধকার বলে দুটো মশাল জ্বালিয়ে নিয়েছে তারা। গল্প

করতে করতে হাঁটছে। আজকের খেলার কথাই হচ্ছে বেশি। সবাই বেশ নিশ্চিন্ত আর খুশি।

কিন্তু গৌর নিশ্চিন্তও নয়, খুশিও নয়। ন'পাড়ার দলে মাউ আর খাউ ছাড়াও আর একটা লোক ছিল, যে অনেকটা ওদের মতোই দেখতে। লোকটা কে তা বুঝতে পারছে না সে। অথচ মনটা টিকটিক করছে। লোকটা তাকে নির্ঘাত খুন করে ফেলতে চেয়েছিল। তার ওপর রাজা রাঘব। রাঘব যে কেন ওখানে জুটল তা-ই বা কে বলবে?

গৌর স্পষ্টই টের পাচ্ছে, এই খেলাটা এক মস্ত ষড়যন্ত্র। সম্ভবত এ-খেলার উদ্দেশ্য ছিল তাকে খুন করা। খেলার মধ্যে বেকায়দায় লেগে সে মরে গেলে সেটা ইচ্ছাকৃত খুন বলে কেউ প্রমাণ করতেও পারত না এবং খুনি ধরা পড়ত না। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। সুতরাং ওরা আবার চেষ্টা করবে। কখন, কোথা দিয়ে যে আক্রমণটা আসবে, তার তো ঠিক নেই। কিন্তু তার মতো এক অতি সাধারণ ছেলেকে খুন করে কী লাভ, সেটাই গৌর ভাবছে।

ন'পাড়ার প্রকাণ্ড মাঠটা পেরিয়ে তারা ফলসাবনে ঢুকল। চারদিকটা ছমছম করছে। একঝাঁক শেয়াল পালাল পাশ দিয়ে। ঘুমন্ত পাখিরা কেউ-কেউ একটু ডানা ঝাপটে ডেকে উঠল ভয় পেয়ে। গৌরের বন্ধুরা খুব নিশ্চিন্তে হাঁটছে। সকলেরই ভারী ফুর্তি। সোনার মেডেল, টাকা পাওয়া, ভরপেট ভালমন্দ খাওয়া— এ-সব তো সচরাচর জোটে না কপালে!

ফলসাবন পার হয়েই আর একটা বড় মাঠ। তার পরেই মল্লারপুরের সীমানা। বন্ধুরা এখান থেকেই ভাগ-ভাগ হয়ে যে যার বাড়ি যাবে। গৌরের বাড়ির দিকে যাওয়ার কেউ নেই। রাস্তাটাও নির্জন। এত রাতে গাঁ-গঞ্জে কেউ জেগে থাকে না।

তেজেন বলল, "গৌর, তুই একা যাবি, একটা মশাল নিয়ে নে।"

মশাল হাতে গৌর একা-একাই চলল, ভয়ডর তার বিশেষ লাগছিল না, কিন্তু কেমন যেন মনের মধ্যে একটা সুড়সুড়ি টের পাচ্ছিল সে। রাঘবরাজা এত সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। কাবাডি খেলায় এত লোকের সামনে ও-রকম হেনস্থা আর লাঞ্ছনা নীরবে হজম করে যাওয়ার পাত্রও নয় মাউ আর খাউ। একটা কিছু করবে।

সামনেই মহাবীর থানের বটতলার ঝুপসি অন্ধকার। থোকা থোকা জোনাকি জ্বলছে। মশালের আলো এখন নিভু-নিভু। সেটা উঁচু করে তুলে ধরে গৌর বটতলাটা দেখার চেষ্টা করল। মনটায় বড্ড সুড়সুড়ি লাগছে। বাঁ দিকে বুড়ো শিবের ভাঙা মন্দিরে একটা তক্ষক ডেকে ওঠে। একটা কেলে খোঁড়া কুকুর এই বটতলায় রোজ শুয়ে থাকে। আজ সেটার কোনও সাড়াশব্দ নেই। পা বাড়িয়েও বটতলাটা পেরোতে একটু ইতস্তত করতে লাগল সে। মশালের নিভু-নিভু আলোয় কাউকে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু জায়গাটা যে বেশ ছমছমে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঘুরপথে যাওয়ারও উপায় নেই। একধারে নিবিড় কাঁটাবন, অন্য ধারে বিপজ্জনক জলার ধারে চোরাবালি, পথ এই একটাই। গৌর করে কী?

একটু ভেবেচিন্তে গৌর দ্বিধার ভাবটা ঝেড়ে ফেলল। তারপর চারদিকে সতর্ক চোখ ফেলে ধীর পায়ে এগোল।

বটের ঝুরি নেমে চারদিকটা যেন জঙ্গলের মতো হয়ে আছে। অনেকটা জায়গা নিয়ে বটের বিস্তার। গৌর যখন মাঝামাঝি এসেছে তখন পিছনে হঠাৎ অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনতে পেল সে। যেন কে শুকনো পাতা মাড়িয়ে দিল। বিদ্যুদ্‌বেগে ঘুরে দাঁড়াল গৌর।

কিন্তু কিছু করতে পারল না। একটা লাঠি এসে মশালটা ছিটকে ফেলে দিল মাটিতে। আর একটা লাঠি এসে পড়ল বাঁ দিকের কাঁধে।

গৌর লাঠি খেয়ে চোখে সরষেফুল দেখে বসে পড়ল মাটিতে। মাথাটা ঘুরছে। মাটি দুলছে। সে অজ্ঞান হয়ে যাবে নাকি? ন'পাড়ার কালীবাড়ির মাঠে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে যে গৌর সাত-সাতটা দানবকে একাই মোর করেছে, সে মাত্র দু'ঘা লাঠির চোটে কুপোকাত হয়ে যাবে? এখনও সোনার মেডেলটা তার গলায় দুলছে যে! ট্যাঁকে রয়েছে প্রাইজের কড়কড়ে দেড়শোটা টাকা। মল্লারপুরের লোকেরা তাকে বীর বলে একটু আগেই কাঁধে নিয়ে কত নাচানাচি করেছে যে! এত সহজে হার মানলে তার চলবে কেন?

এই সব ভাবতে কয়েক সেকেন্ড মাত্র সময় নিয়েছে সে। এর মধ্যেই উপর্যুপরি কয়েকটা লাঠি এসে পড়ল তার ওপর। ভাগ্যি ভাল যে, মশালটা পড়েই নিভে গেছে। অন্ধকারে তাই লাঠিগুলোর সবক'টা তার শরীরে পড়ল না। একটা মাজায় লাগল বটে, কিন্তু তত জোরে নয়। বোধহয় বটের কোনও ঝুরিতে ঠেকে গিয়েছিল লাঠিটা। আর দুটো লাঠি পরস্পরের সঙ্গে লেগে কাটাকুটি হয়ে গেল।

কে একজন চাপা স্বরে বলল, "শেষ করে দে! শেষ করে দে! তারপর কবচটা ছিঁড়ে নে কোমর থেকে। নইলে রাজার কাছে মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না।"

গৌর মাথা বাঁচানোর জন্য একটা হাত তুলে রেখেছিল। একটা লাঠি এসে পড়ল ঠিক তার মুঠোয়। প্রচণ্ড লাগল হাতে। মনে হল চামড়া ছড়ে গেল লাঠির চোটে। কিন্তু গৌর তবু চেপে ধরল লাঠিটা। প্রথমে একহাতে, তারপর দু'হাতে, এক হ্যাঁচকা টান মেরে অদৃশ্য আততায়ীর হাত থেকে লাঠিটা ছিনিয়ে নিয়েই খানিকটা হামাগুড়ি দিয়ে সরে গিয়ে লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল গৌর।

তারপরে অন্ধকারে কী যে হল তা গৌর বলতে পারবে না। তার আনাড়ি হাতের লাঠি অন্ধকারে এলোপাথাড়ি চলতে লাগল। ঠকাঠক-ঠকাঠক শব্দ উঠতে লাগল মুহুর্মুহু। অদৃশ্য আততায়ীদের

শরীরেও লাগল বোধহয়। কে একজন চেঁচাল—"উঃ!" আর একজন বলল, "বাবা রে!"

মিনিট কয়েক লড়াই চলার পর গৌর টের পেল, ওরা রণে ভঙ্গ দিচ্ছে। একজোড়া পা বাজারপানে দৌড় মারল। একজন বুড়ো শিবের মন্দিরের দিকে ছুটল। একজন মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। চার নম্বরটা সাঁত করে কোথায় লুকিয়ে পড়ল লাঠি ফেলে।

হতভম্বের মতো লাঠি হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল গৌর। চার-চারটে লোক যে তার জন্য ওঁত পেতে ছিল, এটা যেন তার বিশ্বাস হল না। চারজনেই যে রণে ভঙ্গ দিয়েছে, এটাও হজম করতে একটু সময় লাগল তার। কোমরে হাত দিয়ে সুতলিতে বাঁধা কবচটা একবার ছুঁয়ে দেখল, গলায় মেডেল বা ট্যাঁকে টাকা, কিছুই খোয়া যায়নি। তারপর সে জোর কদমে হাঁটতে লাগল বাড়ির দিকে।

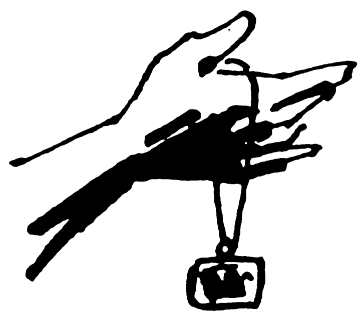

বাড়ি ঢুকে গৌর একটু অবাক হয়ে দেখল দাদার ঘরের দাওয়ায় হ্যারিকেন জ্বলছে। দাদা আর বউদি বসে বসে মশা তাড়াচ্ছে। প্রথমে গৌর ভেবেছিল রাত হয়েছে, বোধহয় তার জন্যেই উদ্‌বেগে দাদা-বউদি বসে আছে বারান্দায়। কথাটা ভেবে গৌর একটু খুশিই হয়েছিল। কিন্তু নিতাইগোপালের কথায় গৌরের ভুল ভাঙল।

গৌরকে দেখে নিতাই বলল, "কে রে, গৌর এলি নাকি?"

"হ্যাঁ দাদা।"

"তোর মাউ আর খাউদাদাকে দেখেছিস? তারা এখনও ফেরেনি।"

"তারা তো ন'পাড়ায় কাবাডি খেলতে গিয়েছিল।"

নিতাই ভারী বিরক্ত হয়ে বলল, "সে-খবর শুনেছি। বেকায়দায় পেয়ে তুমি তাদের হেনস্থাও করেছ, কিন্তু তোমার বিচার পরে। তারা গেল কোথায়?"

"আমি তো তা জানি না।"

গৌরের বউদি কান্নাজড়ানো খনখনে গলায় বলল, "তা জানবে কেন? খেয়ে খেয়ে গতর হয়েছে, আমার ভাই দুটো খেলতে গিয়েছিল, ধরে সবাই মিলে মেরেছ, লজ্জা করে না? এখন সত্যি করে বলো, তাদের কী হয়েছে। মেরে পাঁকে পুঁতেটুঁতে দিয়ে আসোনি তো?"

গৌর অবাক হয়ে বলল, "আমি মারব কেন?"

বউদি ফুঁসে উঠে বলল, 'কেন মারবে তা জানো না? দিনরাত তো হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরছ! চোর গোবিন্দ, বুড়ো কবরেজ আর ভণ্ড ফকিরটার সঙ্গে সাঁট করে ওদের সরানোরও মতলব করেছ, সব জানি। ওরা নিজেরাই আমাকে বলেছে। এই বলে রাখছি, আমার ভাইরা যদি না ফেরে, তা হলে তোমাকে আঁশবঁটি দিয়ে আমি দু'খানা করে কাটব।"

নিত্যগোপালও রাগের গলায় বলল, "তোমার ব্যবহারে লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেছে। আবার সোনার মেডেল গলায় ঝুলিয়ে রেখেছ! লজ্জা করে না। মাউ আর খাউ কী এমন দোষ করেছিল যে, সবাই মিলে ওদের ও-রকম মারধর করলে?"

গৌর এত অবাক জীবনে হয়নি। কিছুক্ষণ সে কথাই বলতে পারল না, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "ওদের মেরেছি কে বলল?"

"বলবে আবার কে! গাঁয়ের লোকেরাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলে গেছে। খেলতে একটু গুঁতোগুঁতি হয়েই থাকে। না হয় তোমাকে

একটু ধাক্কাধাক্কিই করেছে তা বলে হাত ভেঙে দেওয়া! ছি!”

“গাঁয়ের লোক কী বলল? তারা কি বলল দোষটা আমার?”

বউদি খনখনে গলায় বলে ওঠে, “তা বলবে কেন? আমার ভাই দুটো এ-গাঁয়ে আছে বলে সকলেরই চোখ টাটায়। সব শত্রু! কী হিহি করে হাসি সকলের! আমার ভাইয়ের হাত ভাঙায় কী আহ্লাদ তাদের! গৌর ভারী বীরত্বের কাজ করেছে তো! কুটুম-মানুষের হাত ভেঙে দিয়েছে। যাও, এবার সোনার মেডেলটা তাদের দেখিয়ে এসো। হুঁঃ, বীর! মুখে নুড়ো অমন বীরের।”

নিতাই বলল, “অত কথায় কাজ নেই। হ্যারিকেনটা নিয়ে যা, যেখানে পাস খুঁজে নিয়ে আয়। আমরা শুতে যাচ্ছি। সকালের মধ্যে যদি তারা না ফেরে, তবে আমাকে পুলিশে খবর দিয়ে তোকে হাজতে পাঠাতে হবে।”

চোখের জল মুছে গৌর হ্যারিকেন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

গৌরের সন্দেহ নেই যে, মহাবীর থানের বটতলায় যারা তাকে আক্রমণ করেছিল, তাদের মধ্যে মাউ আর খাউ ছিল। খেলার মধ্যে কী হয়েছে তা সেই উত্তেজনায় গৌরের আর মনে নেই। তবে মাউ বা খাউ, কারও হাত ভেঙেছে বলে তার মনে হয় না। যদি ভেঙে থাকে, তা হলে অবশ্য লজ্জার কথা।

গৌর হারিকেন হাতে মহাবীর থানের দিকে হাঁটছিল। যদি ওদের পাওয়া যায় তবে ওখানেই পাওয়া যাবে।

রাত আরও গভীর হয়েছে। আরও নিশুতি। চারদিক ছমছমে-থমথমে। কেমন যেন মনের মধ্যে ফের সুড়সুড়িটা টের পাচ্ছে গৌর। কী যেন একটা ঘটবে।

গৌর বটগাছটার ছায়ার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াল। তার পা সরছিল না। দূর থেকেই সে গলা-খাঁকারি দিয়ে মৃদস্বরে ডাকল, “মাউদাদা! খাউদাদা!”

কেউ জবাব দিল না।

গৌর আরও দু'পা এগোল। আবার ডাকল, এবারও জবাব নেই। একটা বিদঘুটে উত্তুরে হাওয়া কনকন করে বয়ে গেল, হ্যারিকেনটা দপদপ করে কয়েকবার লাফিয়ে ঝপ করে নিভে গেল। নিকষ্যি অন্ধকার গ্রাস করে নিল চারদিক।

কিন্তু সেই অন্ধকারে এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। এমন কাণ্ড গৌর আর কখনও দেখেনি।

হ্যারিকেনটা নিভে যাওয়ার একটু পরেই হঠাৎ বটতলার অন্ধকারে দপ করে একটা নীলচে আলো জ্বলে উঠল। খুব উজ্জ্বল নয়, কিন্তু ভারী নরম, ভারী মায়াময় এক আলো। যেন জ্যোৎস্নার সঙ্গে আকাশের নীল রংখানা কে গুলে মিশিয়ে দিয়েছে। সেই অদ্ভুত আলোয় বটতলাটা যেন এক রূপকথার রাজ্য হয়ে গেল। কিছুই আর যেন চেনা যায় না। বুড়ো শিবের ভাঙা মন্দির, বাঁধানো চাতাল, বটের ঝুরি সব যেন ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল। নীল আলোর মধ্যে ফুটে উঠল একটা ধপধপে সাদা সিংহাসন।

গৌর পালাতে গিয়েও পারল না। সম্মোহিতের মতো চেয়ে রইল সামনের দিকে। আঠাকাঠি দিয়ে যেমন পাখি ধরে, তেমনি করে কে যেন আটকে ফেলল গৌরকে। সে পিছোতে পারল না, ঘুরে দৌড় দিতে পারল না, বরং ধীরে ধীরে চুম্বকের টানে এক পা-এক পা করে এগিয়ে যেতে লাগল বটতলার দিকে।

এখানে এমন ধপধপে সাদা সিংহাসন এল কোত্থেকে? এমন অদ্ভুত আলোও তো জন্মে দেখেনি গৌর! বটতলায় হাজারটা ঝুরির ভিতরে বিচিত্র এক আলোছায়া। গাছের মোটা গুঁড়িটার কাছে ফাঁকা সিংহাসনটা কে রেখে গেল?

গৌর ধীরে-ধীরে সিংহাসনটার কাছে এসে দাঁড়াল, না, নিজের ইচ্ছেয় নয়। এতক্ষণ যেন এক অদৃশ্য সুতোর টান তাকে নিয়ে

এসেছে এইখানে। একটা অদৃশ্য হাত যেন হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিল নির্দিষ্ট জায়গায়।

গৌরের চোখে পলক পড়ছে না। বুকের ভিতর সেই গুড়গুড়-সুড়সুড়। হঠাৎ একটা সাদা আলোর ঝলকানি দেখতে পেল গৌর। তারপর নিজের চোখকে বিশ্বাস হল না তার—সিংহাসনে রাজা রাঘব বসে আছে। সেই অদ্ভুত লম্বা লোকটা। পরনে সাদা একটা জোব্বা, মাথায় জরির কাজ করা সাদা একটা পাগড়ি।

রাজা রাঘব গৌরের দিকে চেয়ে একটু হাসল। বলল, "খুব বাহাদুর ছেলে তুমি। বহোত খুব। আমি তোমার ওপর খুশি হয়েছি।"

গৌর জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, "আপনি কি ভোজবাজি জানেন?"

রাজা রাঘব মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বলল, "তা একরকম বলতে পারো। তবে ভোজবাজি মানেই হল বস্তুবিদ্যার সঙ্গে আত্মশক্তির প্রয়োগ। অতসব তুমি বুঝবে না। তবে তুমি যে আজ ন'পাড়ার সঙ্গে কাবাডি খেলায় ভোজবাজি দেখালে, সেটাও একটা বস্তুবিদ্যার কারসাজি।"

গৌর অবাক হয়ে বলল, "বস্তুবিদ্যা? কই, আমি তো কিছু জানি না?"

রাঘব মাথা নেড়ে বলল, "তোমার জানার কথাও নয়। আর সেইজন্যই বস্তুটি তোমার পক্ষে বিপজ্জনক।"

"আমার তো তেমন কোনও বস্তু নেই?"

রাঘব মৃদু-মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বলল, "আছে বই কী! কিন্তু বাঁদরের গলায় যেমন মুক্তোর মালা বেমানান, তোমার মতো আনাড়ির কাছে ও-বস্তু থাকাও তেমন বিপজ্জনক। বস্তুটি আমি চাই।"

গৌর এক পা পিছিয়ে বলল, "আমার কাছে কিছু নেই।"

মুহূর্তের মধ্যে রাঘবের হাসিমুখ পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল। চোখ দুটো ধকধক করে উঠল। হিংস্র গলায় রাঘব বলল, "পালানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। এই জায়গাটা আমি বন্ধন দিয়ে রেখেছি। আর-একটা কথাও মনে রেখো, যে বস্তুবিদ্যার জোরে আমার লোকদের হাত থেকে বেঁচে বেরিয়ে গেছ, তা দিয়ে আমায় ঠকাতে পারবে না।"

গৌর কী বলবে বুঝতে না পেরে শুধু অপলক চেয়ে রইল।

রাঘব ক্রূর চোখে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, "কবচটা কোমর থেকে খোলো।"

শুনে গৌরের মনে হল, এই আদেশ পালন না করে তার উপায় নেই। ওই কণ্ঠস্বর যেন দৈববাণী। তার একখানা হাত আস্তে-আস্তে কোমরের দিকে উঠে এল।

রাঘব বলল, "কবচটা খুলে নাও। তারপর জলার ধারে ওই চোরাবালিতে ছুড়ে ফেলে দাও।"

গৌর কোমরের সুতলিটার গিঁট খুলল। তারপর কবচটা হাতে নিয়ে ধীর পায়ে জলার দিকে এগিয়ে গেল।

পিছন থেকে রাঘবরাজার গলা গমগম করে উঠল, "ফেলে দাও! ছুড়ে ফেলে দাও!"

গৌর কবচসুদ্ধু হাতটা মাথার ওপর তুলল। তারপর প্রাণপণ শক্তিতে সেটা ছুড়ে দিল জলার দিকে।

তারপর আস্তে-আস্তে ঘুরে দাঁড়াল সিংহাসনের দিকে।

কিন্তু বটতলা নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে গেছে আবার। সেই আলো নেই, সিংহাসন নেই। শুধু অন্ধকার থেকে একটা গমগমে গলা বলে উঠল, "এবার বাড়ি যাও।"

শরীরটা দুর্বল লাগছিল গৌরের। এতক্ষণ যে নির্ভয়, নির্ভার মন

ছিল, তা আর নেই। এখন তার ভয় করছে, শীত করছে, ঠকঠক করে কাঁপছে সে। তাহলে কি কোনও কার্যকারণে তার কবচটার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল? কবচের গুণেই কি সে ন'পাড়ার সাত-সাতটা দানবীয় খেলুড়েকে মোর করে দিয়েছিল দু'দুবার? আর জাগ্রত সেই কবচের জন্যই রাজা রাঘবের এত দুশ্চিন্তা?

গৌর আর ভাবতে পারল না। সে প্রাণপণে বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল।

বাড়িতে ঢোকার মুখেই একটা বাঁশঝাড়। অন্ধকারে দেখতে পায়নি গৌর, একটা বাঁশ ঝুঁকে পড়েছিল রাস্তার ওপর। সেটায় পা বেধে ধমাস করে পড়ে গেল সে। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। ভয়ে সিটিয়ে গেল হাত-পা। সে বুঝল যে, আর রক্ষা নেই। এবার শত্রুপক্ষ তাকে পিঁপড়ের মতো পিষে মারবে।

গৌর চেঁচাল, "বাঁচাও..."

একটা হোঁতকা হাত তার মুখটা চেপে ধরল অন্ধকারে।

কানের কাছে কে যেন বলে উঠল, "চেঁচাস না! খবরদার!"

গৌর একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, "গোবিন্দদা!"

"এদিকে আয়, তফাতে গিয়ে দাঁড়াই। কথা আছে।"

কাঁপতে কাঁপতে গোবিন্দর পিছু-পিছু সে বাঁশঝাড় পেরিয়ে একটা জংলা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

হাঁপাতে হাঁপাতে গোবিন্দ বলল, "আর রক্ষে নেই। প্রাণ বাঁচাতে যদি চাস তো এক্ষুনি এখান থেকে পালা!"

গৌর সভয়ে বলল, "কোথায় পালাব গোবিন্দদা? আমার যে যাওয়ার জায়গা নেই। আর পালিয়েই বা হবে কী? আমার বাঁচার ইচ্ছেও নেই।"

গোবিন্দ চোখ কপালে তুলে বলে, "কেন রে, বাঁচার ইচ্ছে নেই কেন?"

গৌরের চোখে প্রায় জল এসে গেল। “বেঁচে থেকে লাভ কী বলো? রাঘবরাজার তোশাখানা খুঁড়ে বের করবে বলে আমাদের ভিটেছাড়া হতে হবে। তার ওপর যদি প্রাণে কোনওরকমে বেঁচেও যাই, সারাজীবন দাদার শালাদের তাঁবেদারি করে মরতে হবে। খাউ-মাউ তো জুটেছেই, বোম্বেটে হাউও এসে জুটল বলে। বড় ভরসা ছিল কবচখানা। তার জোরেই আজ কাবাডিতে খুব লড়েছিলাম। তা সেটাও গেল রাঘবরাজার পাল্লায় পড়ে। বেঁচে থেকে আর লাভ কী?”

গোবিন্দ একটু মাথা নেড়ে বলল, “সবই জানি রে। তুই ভাবিস তুই বুঝি একা! তা নয় রে বোকা। আমরা কেউ-না-কেউ সবসময়ে তোকে চোখে-চোখে রাখছি। যা-যা ঘটেছে, সব স্বচক্ষে দেখেছি।”

গৌর অভিমানভরে বলল, “দেখেছ! তাও আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে না!”

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলল, “উপায় নেই! রাঘবরাজার সঙ্গে পাল্লা টানতে পারি, আমাদের তেমন ক্ষমতা কোথায়? তোকে বশ করে ভেড়া বানিয়ে কবচ-ছাড়া করল, তাও মুখ বুজে হজম করতে হল। কিন্তু কাছে গেলে আমারও তোর মতোই দশা হত।”

গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, “এতকাল কবচটার মহিমা বুঝতে পারিনি। ঘুমন্ত ছিল। আজই কিন্তু কবচটা জ্যান্ত হল। আমার শরীরটায় আজ ঝিলিক খেয়ে গেল বারবার।”

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলল, “দুর বোকা। কবচ জাগেনি।”

“জাগেনি? তাহলে এ-সব হল কী করে?”

“কবচ জাগলে তার লক্ষণ আমরা ঠিকই টের পেতাম। যোগেশ্বরবাবার তুক আছে। কবচ জাগলে আমরা যারা তাঁর চেলা, সবাই নীল আকাশে তিনবার বিদ্যুতের ঝলক দেখতে পাব।”

“তা হলে কী করে এতসব কাণ্ড হল?”

"তুই বড় বোকা গৌর। যে ক্ষমতা আজ তুই দেখিয়েছিস, তা কবচের ক্ষমতা নয়, তোরই ক্ষমতা।"

গৌর বিস্ময়ে হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "আমার? আমি সাতটা দানবকে ও-রকম গো-হারান হারিয়েছি? বলো কী গোবিন্দদা!"

"ঠিকই বলছি। আরে হাঁদারাম, যোগেশ্বরবাবার দেওয়া কবচ যদি জাগত তা হলে কি রাঘব অত সহজে তোকে হিপনোটাইজ করতে পারত?"

গৌর জিজ্ঞেস করে, "তা হলে কবচ জাগত কীসে? কেমন করে?"

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলে, "তা জানি না। সে-সব আমাদের যোগেশ্বরবাবা বলে দেননি। তবে এটুকু জানি, ঠিক সময়ে ঠিক যোগাযোগে কবচ জাগবে। আর সেইটেই আমাদের একমাত্র ভরসা। নইলে রাঘবরাজা গাঁয়ের পর গাঁ শ্মশান করে দেবে।"

গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "আর ভরসা করে কী হবে? কবচ তো চোরাবালিতে ডুবে গেছে।"

"তা বটে। কিন্তু কবচ না থাকলেও তোর নিজের ক্ষমতাও যে কিছু কম নয়, তা তো আজ টের পেলি!"

"সে-ক্ষমতা দিয়ে কি রাঘবরাজার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাবে?"

"সে-ক্ষমতাটাও যে বড় ফ্যালনা নয় রে। আমরা যারা বুড়োহাবড়া, বয়সের গাছপাথর যাদের নেই, তারা অবধি মরার কথা ভাবি না, তুই ভাবছিস কেন? এখন তুই-ই যে আমাদের বড় ভরসা।"

গৌর অবাক হয়ে বলে, "আমি তোমাদের ভরসা? বলো কী? না হয় গায়ে একটু জোরই আছে, আর কাবাডিও মন্দ খেলি না, তা বলে রাঘবরাজার সঙ্গে পাল্লা দেব এমন সাধ্যি কী?"

গোবিন্দ চিন্তিতভাবে বলল, "গায়ের জোরটাও কিছু ফ্যালনা নয়

রে। তাতেও মাঝে মাঝে কাজ হয়। তবে কিনা রাঘবের গায়ে অসুরের জোর। তার ক্ষমতাও অনেক বেশি। কিন্তু তা বলে নিজেকে ছোট ভাবতে নেই। যদি একবার ধরে নিস 'পারব না' তা হলে আর কিছুতেই পারবি না। অন্তত 'পারব' বলে একটা ধারণা রাখতে হয়।"

গৌর বলল, "তা হলে পালাতে বলছ কেন?"

'পালানো মানেও একটা কৌশল। এইমাত্র দেখে এলাম তোর বাড়িতে রাঘব জনাকয়েক যমদূত মোতায়েন রেখেছে। দুটো বসে আছে তোর ঘরের পিছনে আমবাগানে, আর দুটো কলার ঝাড়ে। ওরা কি তোকে ছাড়বে?"

গৌর অবাক হয়ে বলে, "মারতে হলে রাঘবরাজা তো বটতলাতেই আমাকে মারতে পারত। এমন হিপনোটাইজ করেছিল যে, আমার হাত-পা শরীর একদম অসাড় হয়ে গিয়েছিল। তখন মারল না কেন?"

গোবিন্দ ঠোঁট উলটে বলল, "কে জানে রাঘবের কী লীলা। তবে তোকে যদি মেরে ফেলে তা হলে আর আমাদের রক্ষে নেই।"

গৌর একটু ভাবল। আশ্চর্য এই যে, রাঘবরাজা তাকে কবচ-ছাড়া করায় সে যেমন ভয় পেয়েছিল, এখন আর সে-রকম ভয় করছে না। শরীরটা বেশ হালকা লাগছে, গায়ে স্বাভাবিক জোর-বলও যেন ফিরে এসেছে। তার চেয়েও বড় কথা, তার মাথায় একটু-আধটু বুদ্ধি-বিবেচনা খেলছে। সে মাথা নেড়ে বলল, "পালানোর কোনও মানেই হয় না। আমার যাওয়ার জায়গাও নেই। তবে আমার মনে হয় রাঘবরাজা আমাকে মারতে চাইছে না। চাইলে অনায়াসে মারতে পারত।"

গোবিন্দ বলল, "তা বটে। তা হলে কী করবি?"

"আমি বাড়ি যাব।"

"যদি যমদূতগুলো তোকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে?"

"দেখাই যাক।"

"তোর সাহস আছে গৌর। ঠিক আছে, আমিও পিছনে রইলাম। আড়াল থেকে নজর রাখব। তেমন বিপদ দেখলে অন্তত একটা পাবড়া বা বল্লম তো অন্তত ছুড়ে মারতে পারব।"

গৌর একটু হাসল। তারপর অন্ধকারে পথ ঠাহর করে করে হাঁটতে লাগল বাড়ির দিকে।

সদরের দিক দিয়ে গৌর গেল না। একটু ঘুরে আমবাগানের পথ ধরল। এ-সব তার চেনা জায়গা, নখদর্পণে। অন্ধকারেও সে বলে দিতে পারে, কোন গাছটায় মৌচাক আছে, কোনটায় কাঠঠোকরার বাসা বা কোনটার প্যাঁচ-খাওয়া শরীরে আছে কুস্তিগিরের আকৃতি।

লোক দুটোকে অন্ধকারেও ঠিকই দেখতে পেল গৌর। কাঁচামিঠে আর বেগমপসন্দ দুটো গাছ একেবারে পাশাপাশি। ভারী ঝুপসি ছায়া। সেই ছায়ায় আরও গাঢ় দুটো ছায়া ঘাপটি মেরে আছে। হাতে কোনও অস্ত্র আছে কি? কে জানে!

গৌর নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। একটা গাছ থেকে আর-একটা গাছের আড়ালে কোলকুঁজো হয়ে ছুটে যাচ্ছিল সে। কাবাডি খেলার দক্ষ খেলোয়াড়ের কাছে ব্যাপারটা খুবই সহজ। কিন্তু লোক দুটো বোকা নয়। অন্ধকারে যতই নিঃশব্দে গৌর এগোক না কেন, লোক দুটো কিন্তু ঠিক টের পেল। আচমকা ছায়া দুটো ছিটকে সোজা হল। তারপর সিটিয়ে গেল গাছের আড়ালে।

গৌর চারদিকটা একটু লক্ষ করল। তারপর কাঠবেড়ালির মতো একটা গাছ বেয়ে উঠে গেল খানিকটা ওপরে। এক গাছ থেকে আর-এক গাছে যাওয়া তার কাছে ছেলেখেলার মতো। লোক দুটো যে-গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে, সে দুটো টপকে গৌর সোজা গিয়ে তার ঘরে পিছনটায় নেমে পড়ল। নামল খুবই সাবধানে, আড়াল রেখে। কেউই দেখতে পায়নি তাকে।

হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে তার ঘরের দাওয়ার পাশে হাজির হল।

কেউ কোথাও নেই। খুব সাবধানে উঠে দাঁড়াল গৌর। দাওয়ায় গা রাখল। উঠতে যাচ্ছে, ঠিক এই সময়ে লোহার মতো দু'জোড়া হাত এসে তার দুই বাহু চেপে ধরল।

গৌর একটুও চমকাল না, ভয়ও পেল না। ঘাড় ঘুরিয়ে লোক দুটোকে একটু দেখল। সাক্ষাৎ যমদূতই বলা যায়। কিন্তু গৌরের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। সে জানে, ইচ্ছে করলে বোধহয় এই যমদূতদের সঙ্গেও সে পাল্লা দিতে পারে।

তবে গৌর কিছুই করল না। ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী চাও তোমরা?"

যমদূতদের একজন একটু অবাক হয়ে বলল, "ভয় পাচ্ছিস না যে! খুব তেল হয়েছে, না?"

"তেল হবে কেন? তেল তো দেখছি তোমাদের।"

ঘাড়ে একটা রদ্দা মেরে যমদূতটা বলল, "কার কত তেল সেটা আজই বোঝা যাবে। চল!"

রদ্দা খেয়ে গৌরের মগজ নড়ে গিয়েছিল। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। চোখে সরষেফুল। তবু শরীরটা ঝাঁকিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "তোমরা বাপু কথায়-কথায় বড় গায়ে হাত তোলো। সবসময়ে কি হাত নিশপিশ করে নাকি?"

"তা করে। তোর মতো চোরকে হাতে পেলে হাত নিশপিশ করবেই।"

"আমি চোর!" গৌর অবাক হয়ে বলে, "কী চুরি করলাম বলো তো!"

যমদূতটা আর-একটা রদ্দা চালিয়ে বলল, "ন'পাড়া থেকে যে সোনার মেডেল নিয়ে এলি, সেটা চুরি নয়? কবচের জোরে জিতেছিস। ও-রকম জেতাকে চুরিই বলে!"

এই বলে যমদূতেরা গৌরকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

বনবাদাড়, মাঠঘাট, কাঁটাঝোপের ভিতর দিয়ে যেখানে এনে হাজির করা হল তাকে, সে-জায়গাটা গৌরের খুব চেনা। সেই বটতলা, যেখানে একটু আগেই রাঘবরাজার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। এখন আর সিংহাসন নেই, সেই স্বপ্নের মতো আলো নেই। শুধু বাঁধানো চাতালে একটা পিদিম জ্বলছে। আধো-অন্ধকারে লম্বা পায়ে পায়চারি করছে রাঘব। তাকে দেখে বাঘের চোখে চাইল। সেই চোখ, যা দেখলে বাঘেরও বোধহয় রক্ত জল হয়ে যায়।

গৌর রাঘবের চোখের দিকে চেয়ে কেমন অবশ হয়ে গেল। সে টের পেল, রাঘবের সাঙ্গোপাঙ্গরা যতই সাংঘাতিক হোক, তারা কেউ রাঘবের হাজার ভাগের এক ভাগও নয়।

গমগমে স্বরে রাঘব বলল, "আমি কে তা জানিস?"

গৌর মাথা নেড়ে ক্ষীণস্বরে বলল, "জানি। আপনি রাজা রাঘব।"

"আর কী জানিস?"

গৌর একটা শ্বাস ফেলল। তার মনটা ধীরে-ধীরে অবশ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিরোধ চলে যাচ্ছে। সে সম্মোহিত হয়ে পড়ছে। ক্ষীণস্বরে গৌর বলল, "আপনি আপনার রাজ্য আবার স্থাপন করতে চান। তার জন্য সৈন্যসামন্ত জোগাড় করছেন।"

"তা হলে সবই জানিস দেখছি। যোগেশ্বর নামে একটা শয়তান এখানে একসময়ে থানা গেড়েছিল। তার কয়েকজন শিষ্যসাবুদ এখনও এখানে আছে বলে খবর পেয়েছি। তারা নাকি আমাকে তাড়াতে চায়?"

"জানি।"

"লোকগুলোকে আমি চিনি না। শুনেছি তারা খুব গোপনে ষড়যন্ত্র আঁটছে। তুই জানিস তারা কারা?"

"জানি।"

"নাম আর ঠিকানা বলে যা।"

"আপনি কি তাদের মারবেন?"

"আমার কাজে যে বাধা দেবে, তাকেই সরিয়ে ফেলতে হবে। কোনও উপায় নেই।"

"আমাদের এই গ্রাম কি আর এ-রকম থাকবে না?"

"না। সব ভেঙে ফেলে দেওয়া হবে। বাড়িঘর, মন্দির, সব। আবার সব গড়ে তোলা হবে যেমন আগে ছিল।"

"আর মানুষজন?"

"এখানকার মানুষ একসময়ে শত্রুতা করে আমাদের তাড়িয়েছিল। এখনও তাদেরই বংশধরেরা এখানে বাস করছে। সুতরাং সবাইকে উচ্ছেদ করা হবে। এবার নামগুলো বল।"

"গোবিন্দদা, কবরেজমশাই, ফকিরসাহেব, সুবলদাদু।"

রাঘব তার যমদূতদের দিকে তাকিয়ে চোখের একটা ইঙ্গিত করল। যমদূত দুটো চোখের পলকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

রাঘব গৌরের দিকে সেই ভয়ংকর চোখে চেয়ে বলে, "রাজা রাঘব বড় একটা ভুল করে না। কিন্তু তোর ব্যাপারে আজ আমার একটা মস্ত ভুল হয়েছে। কবচের জোরে নয়, নিজের ক্ষমতাতেই তুই আজ অনেক ভেলকি দেখিয়েছিস।"

গৌর চুপ করে রইল।

রাজা রাঘব বলল, "আমি তোর ওপর খুশিই হয়েছি। যদিও তুই যোগেশ্বরের এক চেলার নাতির নাতি, তবু তোকে ক্ষমা করতে পারি। একটা শর্তে।"

"কী শর্ত?"

"আমার হয়ে কাজ করতে হবে। একটু বেচাল দেখলেই খুন করব। আর কথামতো চললে কোনও অভাব থাকবে না।"

"আমাকে আপনার দলে নিতে চান?"

"চাই। তবে আমার দলে আসতে গেলে শুধু গায়ের জোর থাকলেই হবে না। শক্ত কলজে চাই। যদি সেই পরীক্ষায় পাস করতে পারিস, তবেই দলে আসতে পারবি।"

"কী পরীক্ষা?"

"হাসতে হাসতে খুন করতে পারা চাই। রক্ত দেখে ভিরমি খেলে হবে না। গেরস্তের ঘরে আগুন দিবি, কিন্তু বুক কাঁপবে না। পারবি?"

"আপনি বললে চেষ্টা করতে পারি।"

"পরীক্ষা এখনই হবে। আমার লোকেরা ফিরে এল বলে।"

বাস্তবিকই কয়েক মিনিট বাদে যমদুতের চেহারার কয়েকজন লোক পিছমোড়া করে বেঁধে টানতে টানতে চারজন লোককে এনে হাজির করল। গৌর দেখল, গোবিন্দদা, কবরেজমশাই, ফকিরসাহেব আর সুবলদাদু। তিনজনেই ভয়ে জড়সড়, মুখে কথা নেই।

রাঘব চারজনকে খুব তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে গৌরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "এই চারটে মর্কটের কথাই বলেছিলি তো।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এখন এক-এক করে এদের ধরে নিয়ে গিয়ে চোরাবালিতে ফেলে দিয়ে আয়। খবরদার, চালাকির চেষ্টা করিস না। আমার লোক নজর রাখবে। ওদিকটায় জলার ধারে একটা ঢিবি আছে। ঢিবির ওপর এক-একটাকে দাঁড় করিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিবি। যা। এইটাই তোর পরীক্ষা।"

গৌর বলল, "যে আজ্ঞে।"

বলেই গৌর গিয়ে কবরেজমশাইয়ের হাত ধরল।

কবরেজমশাই ফোঁত করে একটা শ্বাস ছেড়ে ঢোক গিলে বললেন, "বাবা গৌর, তোর মনে কি এই ছিল?"

পিছন থেকে এক যমদূত একখানা রদ্দা মারতেই কবরেজমশাই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। গৌর তাঁকে ধরে তুলল। তারপর হঠাৎ যমদূতটার ঘাড় ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "এ শিকার আমার। স্বয়ং হুজুর সামনে রয়েছেন। এ-রকম বেয়াদবি আর করলে মুণ্ডু ছিঁড়ে দেব। খেয়াল রেখো।"

সকলেই অবাক হয়ে গৌরের দুঃসাহস দেখল। যমদূতেরা হয়তো সবাই মিলে লাফিয়ে পড়ত গৌরের ওপর। কিন্তু সেই সময়ে রাজা রাঘব চারদিক প্রকম্পিত করে বলে উঠল, "শাবাশ! এই তো চাই।"

কবরেজমশাই কাঁপতে কাঁপতে ঢিবির ওপর উঠলেন। অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করে বীজমন্ত্র জপ করছেন, শুনতে পেল গৌর। তাদের দু'জনের দু'দিকে চারজন-চারজন করে আটজন বল্লম লাঠিধারী লোক।

কবরেজমশাই কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "গৌর, শেষে ব্রহ্মহত্যার পাতকী হলি? রাঘবের দলে গেলি? ওঃ, ভাবতে পারি না। আর কিনা তুই-ই ছিলি আমাদের শেষ ভরসা! নাঃ, এর চেয়ে মরণ ভাল।"

বলতে বলতেই কবরেজমশাই উচ্চৈঃস্বরে বীজমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ঢিবি থেকে লাফ দিলেন। প্রায় হাত-দশেক নীচে চোরাবালি। গৌর ঝুঁকে দেখল, কবরেজমশাই বারকয়েক হাত-পা ছুড়লেন, তারপর তলিয়ে যেতে লাগলেন বালির মধ্যে।

এর পর সুবলদাদু। তিনি কোনও কথা বললেন না। কথা এমনিতেও কম বলেন। ঢিবির ওপর ওঠার সময় শুধু ট্যাঁক থেকে একটুকরো সুপুরি বের করে মুখে দিলেন। ওইটেই তাঁর একমাত্র নেশা। তারপর গৌরের দিকে চেয়ে বললেন, "কুলাঙ্গার।"

এই বলে তিনিও লাফ দিলেন। ঠ্যালা-ধাক্কা দিতে হল না।

ফকিরসাহেব কেবল একবার রোষকষায়িত লোচনে গৌরের

দিকে চেয়ে বললেন, "ফুঃ, আমাকে মারা কি অত সোজা রে? শরীরখানা ছেড়েই আরশিতে ঢুকে পড়ব। তারপর কেবল ফুর্তি আর ফুর্তি। তোরা কাঁচকলা খা।" এই বলে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফকিরসাহেব গিয়ে ঢিবির ধারে দাঁড়ালেন। তারপর চোখ বুজে একবার আল্লার নাম স্মরণ করেই মারলেন লাফ।

গোবিন্দ কোনও কথা বলল না, তাকালও না। চুপচাপ উঠে চলে এল ঢিবির ধারে। লাফ মারার আগে চাপা স্বরে শুধু বলল, "ঝিলিক দেখা গেছে।" তারপরেই লাফিয়ে পড়ল চোরাবালিতে।

কথাটার অর্থ প্রথমে বুঝতে পারেনি গৌর। তারপর মনে পড়ল। গোবিন্দদাই তাকে বলেছিল যে, কবচ জাগলে বিনা মেঘেও আকাশে তিনবার ঝিলিক দেখা যাবে। কিন্তু গৌরের এখন সে-সব ভাববার সময় নেই। রাঘবরাজাকে খুশি করাই এখন তার জীবনের লক্ষ্য। তার বেশ আনন্দ আর উত্তেজনা হচ্ছিল মনের মধ্যে। সে লোকের ঘরবাড়ি জ্বালাবে, গ্রামের পর গ্রাম শ্মশান করে দেবে, একের পর এক মানুষ মারবে। কী যে মজা হবে! ওঃ! তার গা রীতিমতো গরম লাগছে। রক্তে যেন আগুন লেগেছে। আর বেশ নেশা-নেশা মাতলা-মাতলা ভাব।

গৌর বটতলায় ফিরে এসে রাঘবরাজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে বলল, "খুশি তো হুজুর!"

হুজুর! গৌর যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে রাঘবরাজাকে 'হুজুর' বলছে! কিন্তু বলে বেশ ভালই লাগছিল তার। ইচ্ছে হচ্ছিল, রাঘবরাজার পায়ের ওপর মাথা রেখে ধুলোয় গড়াগড়ি খায়। আহা, রাঘবরাজার মতো মানুষ হয় না। মানুষও নয়, দেবতা। গৌরের চোখে আনন্দাশ্রু বইছিল।

রাঘবরাজা গম্ভীর মুখে তার বিশাল দক্ষিণ বাহুটি তুলে বলল, "নাঃ, বাহাদুর আছিস বটে! শাব্বাশ!"

"তা হলে পাস তো হুজুর? দলে নেবেন তো?"

"হ্যাঁ। এবার যা, গাঁয়ের গোটা দুই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে আয়।"

গৌর সঙ্গে সঙ্গে ছুটল। পথের ধারে দুটো খোড়ো ঘরে আগুন ধরিয়ে আবার দৌড়ে ফিরে এল। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে, লোকজন প্রাণভয়ে চেঁচামেচি, দৌড়োদৌড়ি করছে, আর গৌর তখন রাঘবরাজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বিগলিত মুখে বলছে, "দিয়ে এসেছি হুজুর। আর কী করতে হবে একবার হুকুম করুন।"

রাঘবরাজা মৃদু হেসে বলল, "আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে। কাল থেকে আমার সত্যিকারের কাজ শুরু হবে। কাল সকালে এসে এইখানে হাজির হবি। তোর যা এলেম দেখছি, তোকেই সর্দার করে দেব। এই নে আমার পাঞ্জা।"

রাঘবরাজা একখানা তুলোট কাগজ গৌরের হাতে দিল। তাতে একখানা প্রকাণ্ড হাতের ভুসো কালির ছাপ। গৌর কাগজটা নিয়ে কপালে ঠেকাল।

রাঘবরাজা বলল, "খুব সাবধানে রাখিস।"

"যে আজ্ঞে।"

"এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমো। কাল অনেক কাজ।"

গৌর হাতজোড় করে বলল, "হুজুর, একটা কথা। অভয় দেন তো বলি।"

"বল বল, অত সংকোচ কীসের?"

"আমার দুই কুটুমকে পাচ্ছি না। খাউ আর মাউ। তাদের খুঁজে নিয়ে না গেলে দাদা বাড়িতে ঢুকতে দেবে না বলেছে।"

এ-কথায় রাঘবরাজার চোখ দুটো ঝলসে উঠল। পিদিমের ম্লান আলোতেও দেখা গেল, লম্বাটে মুখখানা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। চাপা হিংস্র গলায় বলল, "কে তোকে বাড়ি ঢুকতে দেবে না?

কার এত বুকের পাটা? তোর দাদাকে যদি কড়াইয়ের মধ্যে পুরে আগুন দিয়ে বেগুনপোড়া না করি...”

“আজ্ঞে হুজুর, মায়ের পেটের ভাই। অতটা করার দরকার নেই।”

রাঘবরাজা ভ্রূকুটি করে কিছুক্ষণ গৌরের দিকে চেয়ে থেকে বলল, “খাউ আর মাউ কোনও কর্মের নয়। বরং ওদের বড়ভাইটা কাজের লোক। খাউ আর মাউকে বেঁধে বুড়ো শিবের মন্দিরে বন্ধ করে রেখেছি। ভেবেছিলাম কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দেব। আমার রাজ্যে অপদার্থের স্থান নেই।”

“হুজুর, আমারও তাতে অমত নেই। বলেন তো নিজের হাতেই কাটব। তবে বউদি বড় কান্নাকাটি করবে।”

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রাঘব বলে, “ঠিক আছে। তুই ওদের নিয়ে যা। একটু নজরে-নজরে রাখিস। তোর মুখ চেয়েই ওদের ছেড়ে দিচ্ছি।”

আধমরা খাউ আর মাউকে নিয়ে বাড়ি ফিরেছে গৌর। তারপর খুব নিশ্চিন্তে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়েছে। ভারী নিশ্চিন্ত। কবচ হারানোর দুঃখ আর নেই। কবচের বদলে রাঘবরাজার পাঞ্জা পেয়ে গেছে সে। আর দুঃখ কীসের? কাল থেকে সে হবে রাঘবরাজার দলের সর্দার। গ্রাম জ্বালাবে, মানুষ মারবে, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। তারপর একদিন হবে রাঘবরাজার সেনাপতি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গৌর স্বপ্ন দেখছিল। সেনাপতি হয়ে সে ঘোড়ায় চেপে সৈন্যসামন্ত নিয়ে একটা রাজ্য জয় করে ফিরছে। তার বল্লমের আগায় গাঁথা একটা নরমুণ্ড। নরমুণ্ডটা ভারী চেনা-চেনা। কিন্তু ঠিক মনে পড়ছিল না মুখটা কার।

হঠাৎ আকাশ থেকে একটা ইগল পাখি শোঁ করে নেমে নরমুণ্ডটা তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছিল। গৌর কি কিছু কম যায়? সঙ্গে সঙ্গে

ধনুক বাগিয়ে তির ছুড়ল। পাখিটা লাট খেয়ে পড়তে লাগল। আশ্চর্য! নরমুণ্ডটা এসে আবার বল্লমে গেঁথে গেল। আর ইগলটা নেমে এসে হঠাৎ দুটো থাবায় চেপে ধরল তার গলা।

গৌরের দম বন্ধ হয়ে এল। চোখ কপালে উঠল। কিন্তু কিছুতেই ইগলটা ছাড়ছে না তাকে। চোখের সামনে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা গেল বারকয়েক। আর সেই যন্ত্রণার মধ্যে গৌর বুঝতে পারল, বল্লমে গাঁথা নরমুণ্ডটা আসলে তারই মুখ। তাই অত চেনা।

ঘুম ভাঙতেই গৌর বুঝল, মস্ত একটা মানুষ অন্ধকারে প্রাণপণে লোহার থাবায় তার গলা চেপে ধরেছে। বুকে হাঁটু।

গৌর বুঝল, আর একটু পরেই সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। তাই পা দু'খানা তুলে সে লোকটার গলায় লটকে একটা ঝটকা দিল। দড়াম করে লোকটা খসে গেল তার বুক থেকে। গৌর বিদ্যুদ্‌বেগে উঠে লোকটাকে একটা লাথি লাগাল কষে। তারপর অনায়াসে তার একটা হাত পিঠের দিকে ঘুরিয়ে অন্য হাতে গলা চেপে ধরল।

গৌরের এই বজ্রবাঁধনে লোকটা খাবি খাচ্ছে।

গৌর জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?"

"আমি হাউ। খাউ আর মাউয়ের বড়ভাই।"

গৌর অবাক হয়ে বলল, "তুমি তো জেলখানায় ছিলে!"

"রাঘব আমাকে ছাড়িয়ে এনেছে। তারপর ন'পাড়ায় লুকিয়ে ছিলুম।"

"তা আমার ওপর তোমার রাগ কীসের?"

"আমার ভাইদের এই হেনস্থার জন্য তুই-ই দায়ী। তুই রাঘবরাজার নজরে পড়েছিস। এখন রাঘব আমাদের পাত্তা দিতে চাইছে না। তোকে খুন করা ছাড়া আমার অন্য উপায় ছিল না।"

"তুমি ন'পাড়ার কাবাডির দলে ছিলে?"

"হ্যাঁ। রাঘব হুকুম দিয়েছিল, খেলার মধ্যে যেন তোমাকে খুন করা হয়।"

"এখন যদি তোমার ঘাড়টা ভেঙে দিই।"

হাউ কোনও জবাব দিল না। কিন্তু আচমকাই পিছন থেকে বেড়ালের পায়ে চার-পাঁচজন লোক ঘরে ঢুকল। তাদের প্রত্যেকের হাতে লাঠি, তলোয়ার, খাঁড়া।

গৌর কিছু করার আগেই তার মাথায় বিশাল একটা লাঠি সজোরে এসে পড়ল। ফটাস করে একটা শব্দ আর সেই সঙ্গে ছড়াক করে খানিক রক্ত ছিটকে পড়ল মেঝেয়। তারপরেই উপর্যুপরি ধুপধাপ লাঠি এসে পড়তে লাগল চারধার থেকে। গৌর নড়বার সময় পেল না। লাঠির ঘায়ে কাটা কলাগাছের মতো অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

হাউ লোকগুলোর দিকে চেয়ে বলল, "লাশ এখানে ফেলে রাখা চলবে না। রাঘব সন্দেহ করবে। রক্তটা ভাল করে মুছে দে। আর চারজন ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে চোরাবালিতে ফেলে দিয়ে আয়। সর্দার হওয়া ওর বের করছি।"

নিশুত রাতে চারজন লোক গৌরের অচেতন দেহখানা চ্যাংদোলা করে বটতলার ঢিবিটার ওপর নিয়ে তুলল। তারপর দু'বার দোল দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল চোরাবালির মধ্যে।

বালির মধ্যে আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেল গৌর। কেউ কিছু জানতে পারল না।

গৌরের চেতনা যখন ফিরল, তখন তার চারধারে বালি আর বালি। ওপরে বালি, নীচে বালি, চারধারে ঝুরঝুর করে ঝুরো বালির স্তর কেবল সরে যাচ্ছে, ঝরে পড়ছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড! গৌরের তাতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। সে দম নিতে পারছে। সে অনুভব করছিল, বালির মধ্যে শক্তমতো ছোট একটা জিনিস বারবার তার

হাতে, পিঠে, বুকে এসে ঠেকছে। গৌর হাত বাড়িয়ে জিনিসটা মুঠোয় নিল।

কবচটা না? হ্যাঁ, সেই কবচটাই তো মনে হচ্ছে! গোবিন্দদা কী যেন বলছিল? হ্যাঁ, বলেছিল যে ঝিলিক দেখা গেছে। তার মানে কি কবচটা জেগে উঠেছে!

কবচটা মুঠোয় চেপে শোয়া-অবস্থা থেকে গৌর উঠে দাঁড়ায়। কোনও অসুবিধে হয় না তার। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, আজ রাঘবরাজার হুকুমে তার চারজন অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষীকে এই চোরাবালিতে ডুবিয়ে মেরেছে। মনটা হায়-হায় করে ওঠে গৌরের। তার বুদ্ধিনাশ হয়ে গিয়েছিল। শোকে পাগলের মতো হয়ে গৌর চারদিকে বালির মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগল ওঁদের। খুঁজতে খুঁজতে চোখের জল ফেলে সে বারবার বলছিল, "এ আমি কী করলাম! এ আমি কী করলাম!"

বেশি খুঁজতে হল না। প্রথমে কবরেজমশাইকে পেয়ে গেল সে। তারপর সুবলদাদু। একটু বাদেই হাত ঠেকল গোবিন্দদা আর ফকিরসাহেবের গায়ে।

একে-একে চারজনকেই টেনেহিঁচড়ে ওপরে নিয়ে এল গৌর। চোরাবালিতে একটুও কষ্ট হল না তার। শরীরটা যেন পালকের মতো হালকা।

চারজনকেই ঘাসজমিতে শুইয়ে একে-একে নাড়ি দেখবে বলে গৌর প্রথমে কবরেজমশাইয়ের কবজিটা ধরতেই কবরেজমশাই খেঁকিয়ে উঠলেন, "ওঃ, কী আমার ধন্বন্তরি এলেন যে! বলি নাড়িজ্ঞানটা আবার তোর কবে থেকে হল?"

গৌর আনন্দে কেঁদে ফেলে বলল, "আপনি বেঁচে আছেন কবরেজমশাই?"

"মারে কে? চোরাবালিতে পড়ার আগে একটা করে

বিশল্যকরণীর বড়ি খেয়েছি না সবাই? মরা কি অত সোজা? তা ছাড়া, কবচ যে জেগেছে, সে-খবরও পেয়েছিলাম কিনা। যাকগে, তোকে ভাবতে হবে না। ওই তিনজনও বেঁচেই আছে। এক্ষুনি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবে।"

গৌর অবাক হয়ে দেখল, সত্যিই তাই। কথা শেষ হতে না হতেই গোবিন্দদা, সুবলদাদু আর ফকিরসাহেব উঠে বসেছেন। একটা হাই তুলে ফকিরসাহেব বললেন, "বেশ ঘুম হল একখানা। ঘুমটার বড় দরকার ছিল।"

গোবিন্দদা গা থেকে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "এখন বসে গল্প করার সময় নেই গো। কবচ জেগেছে, কিন্তু যোগেশ্বরবাবার বলা আছে, মস্ত বিপদের দিনে কবচ জেগে উঠবে বটে, তবে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। তারপর যেই ভোর হবে, অমনি চিরতরে নিভে যাবে। সুতরাং যা করার এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। ওঠো সব, উঠে পড়ো।"

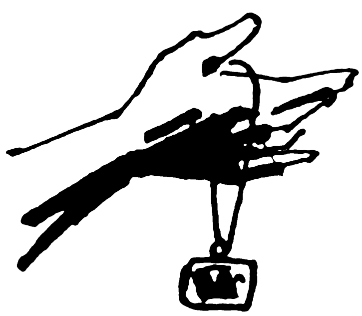

রাঘবরাজার গুপ্ত আবাসের কথা তার সাঙ্গোপাঙ্গরা কেউ জানে না। জানা সম্ভবও নয়।

নদীর বাঁকের মুখে যেখানে স্রোত ভয়ংকর, সেইখানে দক্ষিণ তীরে মাটির মধ্যে কিছু ইট গাঁথা আছে দেখা যায়। কোনও প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ বলে লোকে তেমন মনোযোগ দেয় না। তা ছাড়া ওই জায়গাতেই নদীর মধ্যে একটা ঘূর্ণি আছে। মানুষ, নৌকো, যা পড়বে তা-ই তলিয়ে যাবে। তাই ভয়ে কেউ ওই খাড়া পাড় আর

ঘূর্ণির কাছাকাছি যায় না। তবে সাধারণ মানুষ যা পারে না, রাঘবের কাছে তা খুবই সহজ কাজ।

নিশুত রাতে রাঘব সেই খাড়া পাড়ের ধারে এসে দাঁড়িয়ে চারদিকে একবার দেখে নিল। তার বাঘের মতো চোখ অন্ধকারেও সবকিছু দেখতে পায়। না, কোথাও কেউ নেই। কেউ তাকে লক্ষ করছে না। রাঘব নিঃশব্দে পাড়ের ধারে ইটের খাঁজে পা রাখল। তারপর অলৌকিক দক্ষতায় ঠিক টিকটিকির মতো প্রায় পনেরো হাত খাড়াই বেয়ে খরস্রোত জলের মধ্যে ঝুপ করে নামল। সেখানে জলের স্রোত এমন প্রবল যে, হাতি অবধি ভেসে যায়। কিন্তু রাঘব ভেসে গেল না। এমনকী, খুব একটা টললও না। জলের মধ্যে টুপ করে ডুব দিল সে। ডুব দিয়ে গভীর থেকে গভীরে নেমে গেল। একদম তলায় যখন নামল, তখন তার কাছ থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে পাতালের এক গহিন গহ্বর। নদীর জল চোরাস্রোতে বিভীষণ বেগে সেই গহ্বরে ঢুকে যাচ্ছে। একটু পা হড়কালেই সেই গহিন গহ্বরের উন্মত্ত জলরাশি কোথায় কোন পাতালগঙ্গায় টেনে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। অন্ধকারে একবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে রাঘবরাজা গহ্বরটার দিকে চাইল। সামনে নদীর পাড়টা যেখানে এসে নীচে ঠেকেছে, সেখানে ইটের ফাঁকে একটা সংকীর্ণ ফাটল। রাঘব ধীর পায়ে সেই ফাটলের মধ্যে ঢুকল। তারপর কতকগুলো খাঁজ বেয়ে উঠে এল খানিকটা ওপরে।

মাটির নীচে অনেকগুলো সুড়ঙ্গের মতো পথ চলে গেছে নানা দিকে। রাঘব সামনের পথটা ধরে একটু নিচু হয়ে লম্বা পা ফেলে দ্রুত এগিয়ে চলল। ক্রমে সুড়ঙ্গটা চওড়া হতে হতে একটা মস্ত হলঘরের মতো জায়গায় এসে শেষ হল। সুড়ঙ্গটা পাথর দিয়ে বাঁধানো। দেয়ালে অনেক কুলুঙ্গি। একধারে একটা মস্ত কাঠের বাক্সের ওপর বিছানা পাতা। একটা দীপাধারে দীপ জ্বলছে। রাঘবের আস্তানা।

রাঘব ভেজা জামাকাপড় ছেড়ে শুকনো পোশাক পরল।

তারপর, দীপটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল কুলুঙ্গির দিকে। কুলুঙ্গিগুলো বেশ চওড়া। প্রত্যেকটাতে একটা করে বড় কাঠের বাক্স, তাতে ঢাকনা দেওয়া। অনেকটা কফিনের মতো।

রাঘব প্রথম বাক্সটা খুলল। দীপের আলোয় দেখা গেল, বাক্সের মধ্যে একটা শুকনো মমির মতো মৃতদেহ। চামড়া কুঁচকে গেছে, চোখ কোটরে ঢোকানো, হাড়গুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। রাঘব ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল। আর-একটা খুলল। এটার মধ্যেও আর-একটা মৃতদেহ। তেমনই শুকনো, কোঁচকানো। একটার পর একটা বাক্স খুলল রাঘব। আবার বন্ধ করল। এ-সবই রাঘবের পূর্বপুরুষের মৃতদেহ। বহুকাল আগে তাদের বংশে মৃতদেহ সংরক্ষণের প্রথা চালু হয়। প্রাসাদ থেকে একটি গুপ্ত সুড়ঙ্গপথে মৃতদেহগুলি এই পাতালঘরে এনে রাখা হত। সেই সুড়ঙ্গ এখন বুজে গেছে। নদীর তলা দিয়ে এখানে আসার পথটি আবিষ্কার করেছে রাঘব নিজেই।

কথা আছে, যদি রাঘবের কোনও বিপদ ঘটে তা হলে এই সব মৃতদেহ আর-একবার, শেষবারের মতো জেগে উঠবে একদিন। জেগে উঠে তাদের বংশের দুলালকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। তারপর আবার ফিরে যাবে মৃতের জগতে।

রাঘব বুঝতে পারছে, আর দেরি নেই। ভোর হতে না হতেই সে শুরু করবে তার বিজয়-অভিযান। এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। অত্যাচার শুরু করলেই ভীরু, কাপুরুষ গাঁ-গঞ্জের লোকেরা পালাবে। একমাত্র বাধা ছিল শয়তান যোগেশ্বরের কয়েকজন চ্যালা। তা সেগুলোও সব নিকেশ হয়েছে। যোগেশ্বরের প্রধান চ্যালা ফটিকের এক বংশধর গৌরকে দিয়েই কাজ হাসিল করবে রাঘব। আর সেইটেই হবে যোগেশ্বরের ওপর তার প্রতিশোধ। না, রাঘবের

আর কোনও বিপদ নেই। সুতরাং এই সব মৃতদেহও আর জাগবে না। এবার কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে রাঘব মৃতদেহগুলি নদীর নীচের সেই গহ্বরে বিসর্জন দেবে।

বিছানায় জোড়াসনে বসে সে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হল। চোখের সামনে ভেসে উঠল তার ভাবী রাজ্য। এই বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতেও সে এমন এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে, যা দেখে অবাক হয়ে যাবে লোকে। সেই রাজ্যে রাজাই হবে সবচেয়ে ক্ষমতাবান। প্রজারা বাস করবে অনুগত দাসের মতো। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা থাকবে না। সামান্য বেয়াদবির শাস্তি হবে মৃত্যু।

ধ্যানস্থ অবস্থায় কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করল রাঘব। ধ্যানটা ভেঙে গেল। একটা শবাধারের ভিতরে একটু নড়াচড়ার শব্দ হল না? কান খাড়া করে শুনল রাঘব।

প্রদীপটা নিয়ে প্রথম কুলুঙ্গিটার কাছে গিয়ে ঢাকনাটা খুব ধীরে খুলল রাখব। চিত হয়ে পড়ে থাকা মৃতদেহ পাশ ফিরে শুয়ে আছে।

রাঘব একটু চমকে উঠল। এ কী? মৃতদেহে কেন জাগরণের লক্ষণ?

আবার ধ্যানস্থ হল রাঘব। আবার অস্বস্তি। শবাধারে শব্দ। আর-একটা মৃতদেহ পাশ ফিরল। তারপর আর-একটা। আর-একটা।

রাঘবের ঘাম হচ্ছে। তবু জোর করে ধ্যানস্থ হওয়ার চেষ্টা করল রাঘব। চোখ বুজেই শুনতে পেল, একটা শবাধারের ঢাকনা সরে যাচ্ছে।

রাঘব চোখ খুলল। শুকনো কঙ্কালসার একটি মৃতদেহ উঠে বসেছে। রাঘব ভ্রূকুটি করে চেয়ে রইল। আস্তে আস্তে মৃতদেহ কুলুঙ্গি থেকে নেমে আসার চেষ্টা করছে।

বিদ্যুদ্‌গতিতে উঠে দাঁড়াল রাঘব। তারপর বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "অসম্ভব! অসম্ভব! আমার সব শত্রুর নিপাত হয়েছে।"

শবদেহ তবু নেমে আসছে কেন?

রাঘব বিছানার পাশ থেকে একটা লম্বা তলোয়ার টেনে নিল হাতে। এই পাতালঘরে কোনও মানুষের পক্ষেই আসা সম্ভব নয়। ওই খাড়া পাড়, চোরাস্রোত, ঘূর্ণির ভিতর দিয়ে কে আসবে এখানে?

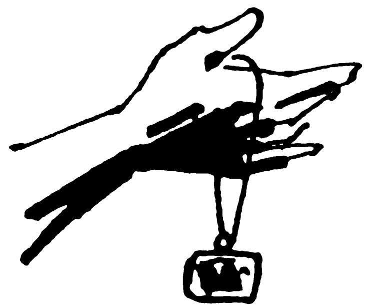

চার বুড়ো মিলে নদীর ধারে একটা দড়ি ঝুলিয়ে বসে ছিল। দড়িটা টানটান হয়ে খরস্রোতের মধ্যে নেমে গেছে। দড়ির প্রান্তে গৌর। চারজন, অর্থাৎ কবরেজমশাই, ফকিরসাহেব, গোবিন্দ চোর আর সুবল বুড়ো দড়িটা মাঝে মাঝে টেনে দেখছে। না, এখনও গৌর দড়ি ছাড়েনি। এ-জায়গাটা বড় বিপজ্জনক। গৌর পারবে তো?

গৌর জলের তলায় নেমে ভয়ে চোখ বুজে ফেলেছিল প্রথমে। উত্তাল স্রোতের জল প্রথমটায় অনেকখানি টেনে নিয়েছিল তাকে। দড়ি ধরে আবার সে জায়গামতো ফিরেছে। কিন্তু জলের নীচে নেমে ঘূর্ণি দেখে তার মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। ওরেব্বাস, একটু পা পিছলে পড়লেই সর্বনাশ। পাতালে টেনে নিয়ে যাবে।

কিন্তু কিছুই হল না। আশ্চর্য এই, জলের তলায় দীর্ঘক্ষণ দমবন্ধ করে থাকতেও তার কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। আর অন্ধকারেও সে বেশ দেখতে পাচ্ছিল।

ফাটলটা খুঁজে বের করতে তাকে বেশি বেগ পেতে হল না। ফাটলের মুখে পা দিয়ে সে দু'বার দড়িটা নাড়া দিয়ে ওপরে জানান দিল যে, সে নেমেছে।

আস্তে আস্তে সুড়ঙ্গ বেয়ে ওপরে উঠল সে। এখানে জল নেই। সে দম নিল। চারদিকে অনেকগুলো সুড়ঙ্গ গেছে। কোনটায় যাবে সে। কবচটা একবার স্পর্শ করতেই মাথাটা যেন পরিষ্কার হয়ে গেল। ওই তো সামনের পথ!

গৌর এগোতে লাগল। খুব ধীরে-ধীরে এবং নিঃশব্দে। ভোর হতে আর দেরি নেই। ভোর হলেই কবচের ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং তাড়াতাড়ি করা দরকার। কিন্তু গৌর এটাও জানে, তাড়াতাড়ি করতে গেলে বিপদ বেশি।

সুড়ঙ্গটা চওড়া হচ্ছে। ক্রমে-ক্রমে একটা মস্ত হলঘরের চেহারা নিচ্ছে।

গৌর থমকে দাঁড়াল। অবাক হয়ে দেখল, পাতালে এক আশ্চর্য ঘর পাথর দিয়ে তৈরি। মাঝখানে একটা দীপ জ্বলছে।

কিন্তু ও কী? ওরা কারা? পাথরের অনেক তাক চারদিকে। প্রত্যেকটা তাকে একটা করে লম্বা কাঠের বাক্স। আর সেই সব বাক্স থেকে কঙ্কালসার, মস্ত মস্ত মাকড়সার মতো ওরা কারা নেমে আসছে? মানুষ? মানুষ কি এ-রকম হয়?

হঠাৎ একটা অমানুষিক তীব্র আর্তনাদে ঘরটা ভরে গেল। গৌরের সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে উঠল সেই শব্দে। মৃতদেহগুলি একসঙ্গে তীব্র নাকিসুরে চিৎকার করতে লাগল! "মার! মার! শত্রু মার! মার! মার! আপদ মার! নির্বংশ হ! নরকে যা!"

চারদিক থেকে মৃতদেহগুলো এগিয়ে আসতে থাকে গৌরের দিকে, কেমন যেন কাঁকড়ার মতো, মাকড়সার মতো চলার ভঙ্গি। চোখ কোটরে, দাঁত বেরিয়ে আছে, হাড়গুলো থেকে চামড়া ঝুলে ঝুলে পড়ছে। বাসি, শুকনো, কবেকার মড়া! তবু আসছে, এগিয়ে আসছে!

গৌর প্রথমটায় নড়তে পারেনি ভয়ে। কিন্তু হঠাৎ যেন কে তাকে একটা ধাক্কা দিল। চনমন করে উঠল রক্ত। ট্যাঁক থেকে কবচটা খুলে

সে মুঠোয় নিল। তারপর খুব দুঃসাহসে ভর করে একটা লাফ মেরে সামনে যে মড়াটা পেল, সেটাকে সাপটে ধরল।

কিন্তু ধরতেই বেকুব বনে গেল গৌর। মড়াটা যেন ধুলোবালি দিয়ে গড়া। সে ছুঁতেই ঝুরঝুর ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে গেল মেঝেয়। চিহ্নমাত্র রইল না। এই আশ্চর্য কাণ্ড দেখে গৌর অবাক। কিন্তু অবাক হয়ে থেমে থাকার উপায় নেই। সময় আর খুব কমই আছে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কবচের খেলা শেষ হয়ে যাবে। গৌর আর-একটা মড়াকে ছুঁল। আর-একটা। ঝুরঝুর-ঝুরঝুর করে মৃতদেহগুলি ধুলোবালির মতো মিলিয়ে যেতে লাগল একে-একে।

শুধু দুটো মড়া একটু তফাতে রয়ে গেল। কাছে আসছিল না। গৌর লক্ষ করল, এ মড়া দুটো অন্যগুলোর মতো তেমন শুঁটকো নয়। চোখও কোটরগত নয়, চামড়াও ঝুলে পড়েনি। একটু রোগাভোগা মানুষের মতোই দেখতে। গৌর তাদের দিকে দু'পা এগোতেই মড়াদুটো চোঁ-চাঁ দৌড়ে একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে পালাল। গৌর তাদের পিছু নিল না। মড়া মেরে আর লাভ কী? এখন তাড়াতাড়ি রাঘবের নাগাল পাওয়া দরকার।

কিন্তু কোথায় রাঘব? গৌর চারদিকে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল। সময় কত হল তা বুঝতে পারছে না গৌর। কিন্তু ভোর হতে যে আর দেরি নেই, সেটা সে জানে। গৌর দৌড়োতে লাগল। একবার এই সুড়ঙ্গে ঢোকে, আবার ওই সুড়ঙ্গে ঢোকে। চারদিকে একটা গোলোকধাঁধা, এর মধ্যে রাঘব কোথায় লুকিয়ে আছে, তা কে বলবে!

ক্রমে ক্রমে ভারী হতাশ হয়ে পড়তে থাকে সে। একটু ভয়ও হয়। রাঘব তো সোজা লোক নয়। মাটির তলায় একটা ভ্যাপসা গরম আর সোঁদা গন্ধ। গৌরের ঘাম হতে থাকে, ক্লান্ত লাগে। তার চেয়েও বড় বিপদ, এতক্ষণ সে অন্ধকারেও বেশ দেখতে পাচ্ছিল। কবচেরই

গুণ হবে। কিন্তু এখন আস্তে-আস্তে চারদিকটা অন্ধকার হয়ে আসছে। গৌর বুঝল, কবচের তেজ নিঃশেষ হয়ে এল প্রায়। আর বেশিক্ষণ নয়।

গৌর সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা বাঁক ঘুরে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। সামনেই কিছু দূরে একটা পিদিম জ্বলছে। একটা ছায়া আড়ালে সরে গেল।

"কে ওখানে?" গৌর জিজ্ঞেস করে।

একটা গমগমে গলা বলে ওঠে, "এসো গৌর, আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি।"

রাঘব! রাজা রাঘব! গৌর হাতের নিষ্ফলা কবচটার দিকে একবার তাকাল।

রাঘবের গমগমে গলা বলে উঠল, "কবচের খেলা শেষ হয়ে গেছে গৌর। তোমার খেলাও। এগিয়ে এসো। পালাবার পথ নেই!"

গৌর আস্তে-আস্তে এগিয়ে গেল। পিদিমের আলোয় সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা চওড়া ঘর দেখতে পেল গৌর। রাঘবকে দেখা যাচ্ছিল না। গৌর ঘরটার মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল, দেওয়ালে অনেক খাঁজ, অনেক কোটর।

দেওয়ালের একটা খাঁজের আড়াল থেকে কালান্তক যমের মতো বেরিয়ে এল রাজা রাঘব। দুটো চোখ ধকধক করে জ্বলছে। মুখটা গ্র্যানাইট পাথরের মতো কঠিন। পিদিমের আলোয় তার দীর্ঘ ছায়াটা ছাদে পৌঁছে গেছে।

গৌর রাঘবের চোখে চোখ রাখতেই কেমন যেন অবশ, নিথর হয়ে এল। হাত-পা সব যেন শিথিল। তার ফের হাঁটু গেড়ে বসতে ইচ্ছে করছিল রাঘবের সামনে। অস্ফুট কণ্ঠে সে বলল, "হুজুর!"

রাঘব একটু হাসল। ডান হাতখানা আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তুলে বলল, "তুমি বাহাদুর ছেলে। কিন্তু বিপজ্জনক। একবার তোমাকে

ক্ষমা করে ভুল করেছি। আর নয়। এগিয়ে এসো।"

"যে আজ্ঞে, হুজুর।"

গৌর এগিয়ে যায়।

"মাথা নিচু করো ক্রীতদাস। ভয় নেই, তোমাকে আমি বেশি কষ্ট দিয়ে মারব না। গলাটা শুধু এক কোপে কেটে ফেলব।"

গৌরের ভারী আহ্লাদ হয়। সে একগাল হেসে বলে, "হুজুর খুশি হলেই আমার আনন্দ। কাটুন হুজুর। একবার শুধু মরার আগে যদি একটু পায়ের ধুলো পেতাম হুজুর।"

রাঘব ভ্রূকুটি করে বলে, "পায়ের ধুলো? ঠিক আছে ক্রীতদাস। নাও।"

গৌর যখন নিচু হয়ে রাঘবের পায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে, তখন এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সে থমকে হাঁ করে চেয়ে রইল। রাঘবের দু' পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছন দিকে অন্ধকারের মধ্যে সে দেখল, যে মড়া দুটো পালিয়ে গিয়েছিল, তারা ঘাপটি মেরে বসে জুলজুল করে তার দিকে চেয়ে আছে।

"কী হল গৌর?"

গৌর জবাব দিল না। মড়া দুটোর চোখ দিয়ে যে তীব্র রশ্মি ছুটে এল, তা যেন গৌরের গায়ে ছ্যাঁকার মতো লাগল। হঠাৎ যেন শরীরটা কেঁপে উঠল। মাথাটার ঝিমঝিমুনি ভাবটা কেটে গেল।

রাঘব তলোয়ারটা ধীরে-ধীরে ওপরে তুলছিল। কিন্তু আচমকাই গৌর তার পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চোখের পলকে উলটে দিল রাঘবকে। দশাসই শরীরটা ধমাস করে যখন পড়ল, সমস্ত সুড়ঙ্গটা কেঁপে উঠল।

কিন্তু এত সহজে কাবু হওয়ার লোক তো রাঘব নয়। পড়তে না পড়তেই সে আবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু গৌর প্রস্তুত ছিল। কাবাডি খেলার সব কলাকৌশলই যেন তার শরীরে কিলবিল

করছে। তলোয়ারসুদ্ধু রাজা রাঘবের হাতখানা ধরে সে এক মোচড়ে অস্ত্রটা কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল। তার শরীর রাগে, ঘেন্নায় নিশপিশ করছে। সম্মোহন কেটে গেছে। এখন—হয় রাঘব, নয় সে।

রাঘব যে সাংঘাতিক শক্তিশালী পুরুষ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার আসল শক্তি হল সম্মোহন। তার চোখের দিকে তাকালেই প্রতিপক্ষ দুর্বল হয়ে বশ মেনে নেয়। সেই সম্মোহনের জাল কেটে বেরিয়ে এসেছে গৌর। রাঘবের গায়ে যত জোরই থাক, গৌরও তো ভেড়া নয়।

দুজনের তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলতে লাগল। কখনও রাঘব তার গলা টিপে ধরে, কখনও গৌর তার কোমর ধরে প্যাঁচ মেরে ফেলে দেয়। কখনও রাঘব তার ঘাড়ে রদ্দা চালায়, কখনও গৌর তার ঠ্যাং ধরে উলটে ফেলে দেয়।

মড়া দুটো ঘাপটি মেরে বসে সবই দেখছিল। একজন মাথা নেড়ে বলল, "হচ্ছে না।"

আর-একজন বলল, "তা হলে মুষ্টিযোগ দিই?"

"দাও।"

তখন একজন মড়া খুব চিকন সুরে বলে উঠল, "রাঘবের চুলে আরশোলা।"

এই শুনে রাঘব বেখেয়ালে নিজের চুলে হাত দিল।

গৌর অবাক হয়ে দেখল, নিজের চুলে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাঘব চোখ উলটে গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

বেকুবের মতো কিছুক্ষণ রাঘবের দিকে চেয়ে রইল গৌর। তারপর তার নজর পড়ল, মড়া দুটোর ওপর। সেইরকম ঘাপটি মেরে বসে তাকে জুলজুল করে দেখছে।

"তবে রে? এবার তোদেরও ব্যবস্থা করছি!" বলে গৌর তাদের

দিকে তেড়ে যেতেই মড়া দুটো ভয়ে সিটিয়ে গেল।

একটা মড়া বলে, "উঁহুঁ উহুঁ, ছুঁসনি রে হতভাগা! তফাত থাক! আমরা মড়া নই!"

"তবে কী?"

দাঁত খিঁচিয়ে মড়াটা বলল, "আমি ফটিক। তুই আমার নাতির নাতি। আমাদের দেবদেহ, ওই এঁটোকাঁটা নরদেহ নিয়ে আমাদের ছুঁলে মহাপাতক হবে।"

ফটিক! গৌর হাঁ হয়ে গেল।

মড়া দুটো উঠে দাঁড়িয়ে গা-ঝাড়া দিল। ফটিক বলল, "সারাজীবন লড়াই করেও রাঘবকে কাবু করতে পারবি না। ক্রমে-ক্রমে তোকে হাফসে-হাফসে মেরে ফেলত। তাই মুষ্টিযোগটা কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলাম।"

গৌর অবাক হয়ে বলল, "মুষ্টিযোগ কী?"

"রাঘবের নিয়তি ওর চুলে। চুলে হাত দিলেই ওর পতন। তা এমনিতে কিছুতেই চুলে হাত দেওয়ার লোক নয় রাঘব। তোর সঙ্গে লড়াই করতে করতে যখন আনমনা হয়ে গিয়েছিল, তখনই কৌশলটা কাজে লাগালুম। এখন আমরা চলে যাচ্ছি। আর দেখা পাবি না।"

বলতে না বলতেই দুজন অন্ধকার একটা রন্ধ্রে ঢুকে সরে পড়ল।

গৌর পিছন থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ফটিকদাদু, উনি কে?"

"যোগেশ্বরবাবা।"

হাউ, মাউ আর খাউকে দাদা বাড়ি থেকে তাড়িয়েছে। গৌরের এখন খুব খাতির বাড়িতে। গোরু চরাতে হয় না, লোক রাখা হয়েছে।

বাসন-টাসন বউদিই মাজে। গৌর পেটভরে চারবেলা ভালমন্দ খায়।

কবরেজমশাই, ফকিরসাহেব, গোবিন্দ, সুবল, যে যার কাজকর্ম করে। সবই আগের মতো। নদীর ধারে দুপুরের দিকে একটা লম্বা লোক জমি চাষ করে হালগোরু নিয়ে। লোকটা কে, তা গাঁয়ের লোক খুব ভাল করে জানে না। শুধু জানে, লোকটাকে খানিকটা চাষের জমি আর বাস্তু দিয়েছেন কবরেজমশাই।

লোকটা আর কেউ নয়, রাজা রাঘব।

9 788177 565904